



সম্পাদক
আবু হামিদ লতিফ

নির্বাহী সম্পাদক
শফিউল আলম

তৃতীয় বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪১২, জুন ২০০৬

বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী

সম্পাদকীয় পরিষদ

সভাপতি ও সম্পাদক	: আবু হামিদ লতিফ
নির্বাহী সম্পাদক	: শফিউল আলম
সদস্য	: মমতাজ জাহান
	শ্যামলী আকবর
	বিবেকানন্দ হাওলাদার

প্রচ্ছদ

আবুল মনসুর

Bangladesh Shiksha Samoiki (Bangla Periodical), year-3, number-1, June 2006, edited by Abu Hamid Latif and Shafiul Alam. Published by Nazmul Haq, Executive Secretary, Bangladesh Forum for Educational Development (BAFED). 278/3 Elephant Road (3rd Floor), Kataban, Dhaka 1205. Phone 9668593, E-mail: bafed@bangla.net, Website: www.bafed.org

Printed by Arka, 6/11 Eastern Plaza, Hatirpool, Dhaka-1205, Phone: 9661129

Price Tk. 100.00
US\$ 5.00

সম্পাদকীয়

মানুষের সভ্যতা, অগ্রগতি, উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনন্য অবদান সর্বজনস্বীকৃত। একুশ শতকের পৃথিবী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যতটুকু অগ্রসর হয়েছে, তার সাফল্য ও ঔজ্জ্বল্য পৃথিবীকে যে মাত্রায় এগিয়ে নিয়েছে, দুর্ভাগ্যজনক হলেও আমাদের মতো তথাকথিত ‘উন্নয়নশীল’ দেশে তার স্পর্শ তেমন লাগে নি। এ বিশ্বায়ন ও বিজ্ঞানের অগ্রগামিতার যুগে আমরা এখনও ব্রাত্য। বিষয়টি আমাদের ভাবিয়ে তুলে। আমাদের এই ভাবনার সাথে সাযুজ্য থাকায় আবদুল-হা আল-মুতীর দীর্ঘ একযুগ আগে এবিষয়ে লেখা প্রবন্ধটি *বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী*র এ সংখ্যায় পুনঃপ্রকাশ করা হল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় আমাদের শিক্ষার হালফিল অবস্থা সম্পর্কে আমরা অনেকে অবহিত আছি বটে, কিন্তু শিক্ষার পশ্চাদ্মুখিতার পেছনে আমাদের অদূরদর্শী-পরিকল্পনা ও শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষা-বাজেটের আর্থিক দৈন্য ও কৃচ্ছতা আমাদের সহজে চোখ পড়ে না নানা শুভংকরের ফাঁকে। শিক্ষার মোট বরাদ্দের সামান্য পরিমাণও গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চার জন্য ব্যয় হয় না, ব্যয় হয় না প্রশিক্ষণ ও উদ্ভাবনমূলক কাজে। এজন্য শিক্ষায় অর্থায়ন বিষয়টি অত্যন্ডুগুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে চোখ ফেরালেই দেখি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য এ পর্যন্ড যতটুকু অর্থব্যয় হয়েছে তাতে শ্রেণীকক্ষে পারদর্শিতা বাড়ে নি, এ স্তরের শিক্ষার মান আশানুরূপ পর্যায়ে পৌঁছে নি এখনও। শিক্ষার মান বৃদ্ধির যে-সোচ্চার উচ্চারণ আজ চারদিকে ধ্বনিত হচ্ছে সেদিকে ভ্রক্ষেপ না করে অপরিবর্তিতভাবে মাধ্যমিক স্তরে অপরিণামদর্শী একমুখী শিক্ষা বাস্দ্ভায়নের যে চেষ্টা তা স্থগিত হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি এখনও নিষ্পত্তি হয় নি। এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তার পর সিদ্ধান্তড়নিতে হবে, একথাটি আজ স্বীকৃত।

বিগত দেড়শ বছরে আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে উলে-খযোগ্য যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত কালানুক্রমিক ইতিবৃত্ত ‘শিক্ষার কালপঞ্জি’তে সংকলিত হল।

বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী’র তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা আমরা ওপরের নানা উপচারে সাজিয়েছি। শিক্ষা গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষা-উন্নয়ন কর্মীদের জন্য আমাদের এ প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা কামনা করি।

সূচি

আগামী দিনের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও তৃতীয় বিশ্ব
আবদুল-১হ আল-মুতী
৭-২০

শিক্ষায় অর্থায়ন - একটি পর্যালোচনা
ড. মনজুর আহমদ
২১-২৫

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে পারদর্শিতা
ড.: ছিদ্দিকুর রহমান
২৭-৪০

মাধ্যমিক স্তরে প্রস্তুতকৃত একমুখী শিক্ষাক্রম
বাস্তবায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা
মোঃ মোক্তার হোসেন, মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম
৪১-৫৫

প্রসঙ্গ: বাকশিল্প
শ্যামলী আকবার
৫৭-৬০

শিক্ষার কালপঞ্জি
৬১-৬৪

আগামী দিনের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও তৃতীয় বিশ্ব

আবদুল-হ আল-মুতী*

মানুষের সভ্যতা যে বহু হাজার বছর ধরে অসংখ্য চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এগিয়েছে তাতে বরাবরই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কোন-না-কোনভাবে ছাপ ফেলেছে। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় চারপাশের প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে, আর সেই সঙ্গে পরিবেশের নানা উপকরণকে সে ক্রমেই নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বেশি করে কাজে লাগিয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে পড়ে মানুষ নিজেও; তাই নিজের সম্বন্ধেও মানুষকে জানতে হয়েছে অনেক কিছু-সে জ্ঞানকেও মানুষ তার কাজে লাগিয়েছে। সামাজিক জীবন যাপনের তাগিদে এসব জানাজানির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের মনোভাব আর মূল্যবোধ-তার ন্যায়-অন্যায়ের উপলব্ধি, কল্যাণ-অকল্যাণের চেতনা, সুন্দর-অসুন্দরের অনুভূতি। এই উপলব্ধি, চেতনা আর অনুভূতির জগৎ কখনো রূপ নিয়েছে অধ্যাত্ম-চিন্ত্রর, কখনো দর্শনের, কখনো শিল্প-সংস্কৃতির।

মানুষ এ পৃথিবীতে আসে এক সহজাত প্রবল কৌতূহল সাথে নিয়ে। তার তাড়নায় সে ক্রমাগত নিজের চারপাশের পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তোলে, সে-সব প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করে। এভাবে সে যে জ্ঞান অর্জন করে চলে তাকেই আমরা বলছি বিজ্ঞান। এই জ্ঞান অর্জনের জন্য যে সংশয় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতি দীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছে তাও এই বিজ্ঞানের অঙ্গ। আর চারপাশের প্রকৃতিকে মানুষ তার প্রয়োজনে যে নানা কলাকৌশলের সাহায্যে কাজে লাগায় বা রূপান্তরিত করে চলে তাকে আমরা বলছি প্রযুক্তি বা প্রয়োগ-কৌশল।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সঙ্গে থাকলেও মানুষ যে বরাবর সচেতন ও সুপরিকল্পিতভাবে তাদের কাজে লাগাতে পেরেছে তা বলা যায় না। প্রথমদিকে জীবন ধারণের জন্য মানুষ যে-সব প্রয়োগ-কৌশল কাজে লাগিয়েছে সেগুলি অন্য প্রাণীদের সহজাত জৈব তাড়না থেকে তেমন উন্নত মানের নয়। সে ধরনের কৌশল প্রয়োগের দৃষ্টান্তও অন্য নানা প্রাণীর মধ্যেও কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। পিঁপড়ে, মৌমাছি, বাবুই পাখি আশ্রয় নির্মাণে আশ্চর্য নিপুণতার পরিচয় দেয়; খাদ্য সংগ্রহের জন্য বানর প্রভৃতি প্রাণী কখনো কখনো রীতিমতো কূটবুদ্ধির আশ্রয় নেয়; খাদ্য সংগ্রহ বা আত্মরক্ষার জন্য হাতিয়ারের ব্যবহার প্রাণিজগতে একবারে বিরল নয়। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা ও মেধার বিকাশের ফলে অবশেষে এই সহজাত বুদ্ধিনির্ভর সনাতন প্রযুক্তির জায়গায় ক্রমে ক্রমে যুক্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচাই হওয়া বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটেছে। সচরাচর ধরে নেয়া হয় পরীক্ষা-নির্ভর বিজ্ঞানের উদ্ভব আজ থেকে মোটামুটি আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক সভ্যতার সময়ে। তখন থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ জ্ঞান মানুষ পরবর্তীকালের কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে; এসব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমন্বয়ে প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও এক সময় গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। অবশ্য বিজ্ঞানের উদ্ভবের আগে মানুষ যে-সব প্রযুক্তি কাজে লাগিয়েছে তাতেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নেহাত কম নয়। পশুপালন, কৃষি ও বয়ন, গৃহ নির্মাণ, মিশরের পিরামিড, চীনদেশে কাগজ, কম্পাস ও বারসূঁচের ব্যবহার, ধাতুর ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানুষের গভীর

* বিশিষ্ট শিক্ষাচিন্ত্রক ও বিজ্ঞান লেখক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব। ১৯৯৮ সালে প্রয়াত।

পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, কৃৎকৌশল ও সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে যুক্তি ও গণিতের সিঁড়ি বেয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার যে বুদ্ধিগত উৎকর্ষ গ্রিকরা অর্জন করেছিল তা মানুষকে বিজ্ঞানের সাধনায় এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রায় বিপুল এক ধাপ এগিয়ে দেয়।

তারপর থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে মেলবন্ধন ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। প্রথম প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দুয়েরই অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে ঘটেছে; কিন্তু তারপর তাদের মধ্যে আন্দ্রসম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হয় তত তাদের উভয়ের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হতে থাকে। ষোড়শ শতকে বিশ্বজগতের স্বরূপ সম্বন্ধে কোপার্নিকাস-কেপলারের বৈপ-বিক আবিষ্কারের সময় থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত; সপ্তদশ শতকে গ্যালিলিও-নিউটন তাকে দৃঢ় ভিতের ওপর দাঁড় করান। এই সময়ের বিজ্ঞান-বিপ-বের পরপরই অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে প্রযুক্তি-বিপ-ব দেখা দেয়। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার নতুন জ্ঞান যন্ত্র-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে উৎপাদন শক্তির বিপুল বিকাশ ঘটাতে আরম্ভ করে। নতুন নতুন ধরনের জ্বালানির উদ্ভব এক্ষেত্রে ক্রমেই নতুন মাত্রা যোগ করতে থাকে। উনিশ শতকে এসে বিদ্যুৎ ও বেতার তরঙ্গের প্রয়োগ গুরু হয়। সেই সঙ্গে জীববিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে বৈপ-বিক রূপান্তর ঘটতে আরম্ভ করে। জীবাণু-তত্ত্বের উদ্ভব ও প্রয়োগ রোগ প্রতিরোধ আর চিকিৎসাতেই শুধু বিপ-ব ঘটায় না, শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রেও বিপুল রূপান্তর আনে। বিশ শতকে এসে কোয়ান্টাম তত্ত্ব, পরমাণু-কেন্দ্রের রহস্য উদ্ঘাটন, বংশগতির ওপর নিয়ন্ত্রণ, মহাকাশ বিজয়, কম্পিউটার ও লেজার প্রযুক্তি প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাত্রায় বিপুল রূপান্তরের সূচনা করেছে।

কখনো কখনো বলা হয়, আমরা আজ তৃতীয় প্রযুক্তি-বিপ-বের যুগে প্রবেশ করেছি। প্রথম প্রযুক্তি-বিপ-ব ঘটেছিল আজ থেকে দু'শ বছর আগে, আঠার শতকের শেষে-যাতায়াত, খনি ও শিল্প-উৎপাদনে বাষ্পীয় শক্তির প্রয়োগের ফলে। দ্বিতীয় প্রযুক্তি-বিপ-ব দেখা দেয় একশ বছর আগে-উনিশ শতকের শেষে-যখন মানুষ, যোগাযোগ, নির্মাণ, যন্ত্রপাতি, আলোকসজ্জা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার এবং রসায়নের নানা আশ্চর্য আবিষ্কারের ফলে অসংখ্য ধরনের নতুন গুণাগুণযুক্ত কৃত্রিম বস্তু উদ্ভাবন করতে আরম্ভ করে। এবার মাত্র গত তিন দশকে কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে আরেক তৃতীয় প্রযুক্তি-বিপ-ব আরম্ভ হয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কুপ্রভাব

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বিপুল অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে মানুষের জীবনে নানা ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে। যাতায়াত ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে, নানা বিচিত্র গুণাগুণের বস্ত্রসামগ্রী মানুষের আয়ত্ত হয়েছে, রোগ-ব্যাধির ওপর মানুষের কর্তৃত্ব যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তা অতীতে অকল্পনীয় ছিল। এসবের ফলে শুধু বিশ শতকের মধ্যেই পৃথিবীর জনসংখ্যা তিন গুণের ওপর বেড়েছে, মানুষের গড়াপড়তা আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, সারা পৃথিবীতে নগরায়ণের মাত্রা প্রায় তিন গুণ বেড়ে মোট জনসংখ্যার চলি-শ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এই সময়ে শুধু যে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বিপুলভাবে বেড়েছে তাই নয়, বৃদ্ধির হারও ক্রমেই দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়েছে। তার ফলে যেখানে বহু লক্ষ বছর আগে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে গুরু করে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা হয়েছিল মোটামুটি একশ কোটি, সেখানে আজ পৃথিবীতে একশ কোটি মানুষ বাড়ছে মাত্র দশ-বার বছরে।

গত দু'তিনশ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপুল বিস্ফোরণ যে মানুষের জন্য কেবলই নিরঙ্কুশ কল্যাণ বয়ে এনেছে তা অবশ্য বলা যায় না। বরং ইতোমধ্যে নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। তার মধ্যে প্রধান হল-

- ক) জনসংখ্যার বিপজ্জনক বৃদ্ধি;
- খ) পরিবেশের অবনতি ও তার ভারসাম্যে বিপর্যয়;
- গ) দেশে দেশে মানুষের জীবনমানে বিপুল বৈষম্য সৃষ্টি; এবং
- ঘ) মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা ও বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি ক্রমেই বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা আজ পাঁচ শত কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। আর মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে হাজার কোটি ছাড়িয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। এ সমস্যার একটি কারণ হল, যে-হারে মানুষ স্বাস্থ্য সুবিধে ও চিকিৎসা-প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার মৃত্যুর হার কমিয়ে এনেছে সেভাবে জন্মহার হ্রাসের সময়োচিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে নি। সাম্প্রতিক কালে উন্নত দেশগুলিতে এ ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা অগ্রগতি ঘটলেও অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলিতে জনসংখ্যা এখনও বিপুলভাবে বাড়ছে। খানিকটা এই জনসংখ্যার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীতে পরিবেশের অবনতি ক্রমেই বিপজ্জনক মাত্রায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। নানা খনিজ সম্পদের বেগুন্মার ব্যবহার এসব অনবায়নযোগ্য শক্তির পুঁজি নিঃশেষ করে আনছে; বন-বনানী, বন্যপ্রাণী ইত্যাদি নির্বিচারে ধ্বংস হচ্ছে; রাসায়নিক, তেজস্ক্রিয় ও আরো নানা ধরনের দূষণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে-এতে প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে সমগ্র পৃথিবীর আবহমন্ডলে নানা ধরনের বিপর্যয়কর পরিবর্তনের আশঙ্কা সৃষ্টি করছে।

আদিম সমাজে মানুষে মানুষে এক ধরনের সাম্য বিরাজ করত। সভ্যতার বিস্ফোরণ নানা জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসম বিকাশের সমস্যা সৃষ্টি করেছে। বর্তমানকালে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি এই অসম বিকাশের ধারাকে যেন আরো বাড়িয়ে তুলছে। তীব্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মুখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রসর জ্ঞান আজ গুটিকয়েক দেশ এবং সে-সব দেশের স্বল্পসংখ্যক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে।

এমনি আরেক বিপদ দেখা দিয়েছে পৃথিবীতে মারণাস্ত্রের সম্ভার বেড়ে ওঠার এবং তার ফলে বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবার কারণে। মানুষের হাতে আজ যে পরিমাণ ধ্বংসের উপকরণ পুঞ্জীভূত হয়েছে তাতে কোন উন্মত্ত রাষ্ট্রনায়কের নির্বোধ তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে ফলে সমগ্র মানব-সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। এ বিষয়ে বিশ্ব-মানব-সমাজের বিবেচনা-বুদ্ধি জাগ্রত না হলে বিশ্বশান্তিভ্রষ্টা দুর্ভাগ্য হয়ে উঠতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতির একটি পরিহাস এই যে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি এ ধরনের সমস্যার জন্য অনেকখানি পরিমাণে দায়ী হলেও এসব সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেবার কথা কেউ ভাবছেন না, এবং সেটা মনে হয় সম্ভবও নয়। বরং একদিকে আরো নতুন জ্ঞান ও নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং সে-সব জ্ঞানের সঙ্গে মানবিক চেতনার সমন্বয় ঘটিয়ে, আর অন্যদিকে সমাজ-সংগঠনের মাধ্যমেই এসব সমস্যার সমাধান হতে পারে। সেটা কতখানি সম্ভব এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জন্য এ ক্ষেত্রে কর্মকৌশল কী হতে পারে সে-সব প্রশ্ন আজ আমাদের জন্য এক অতি জরুরি বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গভীর জ্ঞানের জগৎ

বিশ শতকের বিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য হল পরমাণুর গোপন কন্দের থেকে মহাবিশ্বের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত

ব্যাপ্ত স্থানকালে আজ মানুষের গভীর অনুসন্ধান প্রসারিত হয়েছে। মানুষ দেখছে আমাদের চারপাশে যা-কিছু ঘটেছে তার মূল কারণ খুঁজতে হলে ক্রমে ক্রমে গিয়ে ঢুকতে হয় বস্তুর গভীর থেকে গভীরতম জগতে। আকাশটা নীল, অস্ফুটামী সূর্য লাল, কোন বস্তু হালকা, কোনটা ভারী, কোন জিনিসের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ বয়, কোনটা ভেতর দিয়ে বয় না-এসব রহস্যের সমাধানের জন্য যেতে হয় বস্তুর একেবারে ভেতরে। তারপরও রহস্য শেষ হয় না, প্রশ্নের জবাবে আসে আরো প্রশ্ন। যেতে হয় আরো গভীরে। তারপর দেখা যায় মহাবিশ্বের নানা ঘটনা ঘটছে শতাব্দী পর শতাব্দী, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে; এতকাল ধরে চলেছে নানা বস্তু আর নানা শক্তির মিথস্ক্রিয়া। প্রশ্ন ওঠে – কী তার প্রকৃতি, কি তার নিয়ম-কানুন, কি তার ফলাফল? সে-সব প্রশ্ন থেকে দেখা দেয় আরো গভীর নানা প্রশ্ন। নানা বস্তু, নানা প্রক্রিয়া রীতিনীতি বুঝতে গিয়ে আমরা এক সময় পৌছাই কখন কিভাবে এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি, কখন কীভাবে এর একদিন সমাপ্তি ঘটবে-এমনি সব মৌলিক প্রশ্নে। আজকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, বিজ্ঞানীরা এমনি সব অতি মৌলিক প্রশ্নের বাস্তবসম্মত সমাধান খোঁজা শুরু করেছেন। সারা পৃথিবীতে কি পরিমাণ বস্তু আছে, কোন্ কোন্ পরিণতির ধারায় সে-সব আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, আগামী দিনে বিশ্বের বস্তুপুঞ্জের পরিণতি কী ঘটতে পারে- এসব বড় মাপের প্রশ্নও আজ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধরাছোঁয়ার মধ্যে এসে পৌঁছেছে।

বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে জেনেছেন যে, আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার কোটি বছর আগে-অর্থাৎ সূর্য এবং সৌরজগতের যখন সৃষ্টি তার প্রায় তিন গুণ সময় আগে- এক মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বজগতের উৎপত্তি। আর সেই অতি প্রবল বিস্ফোরণের ধাক্কায় বিশ্বজগতের যে বিস্ফুরণ শুরু হয়েছে তা আজো চলেছে। গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সি সব বিপুল বেগে সরে যাচ্ছে পরস্পর থেকে। কিন্তু এই মহাবিস্ফুরণ কি চিরকালই চলতে থাকবে? না কি বস্তুপুঞ্জ তার নিজেরই মহাকর্ষজনিত আকর্ষণের টানে আবার সঙ্কুচিত হতে হতে অবশেষে আজ থেকে পাঁচ হাজার কোটি বছর পর শেষ হবে আর এক প্রচণ্ড মহাসঙ্কোচনে? - এ প্রশ্নের জবাব নির্ভর করছে মহাবিশ্বে মোট কী পরিমাণ বস্তু আছে তার ওপরে। মহাবিশ্বে সব দৃশ্য আর অদৃশ্য বস্তুর পরিমাণ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাপজোখ চলেছে। আর এই যে আজ বিশ্বজগতের এমন গভীর মহাসত্যকে নিয়ে আসা কল্পনার জগৎ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ধরাছোঁয়ার স্ফুরণ-এও কি মানুষের মেধা আর মননের জগতের কম বড় এক বিষয়?

কখনো কখনো মনে হতে পারে, বিজ্ঞানীদের এসব জল্পনা বুঝি কেবলই আকাশ-কুসুম কল্পনা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যখন অনেক আগে থেকে আঁকজোখ কষে বলেন অমুক তারিখের অমুক সময়ে সূর্যে গ্রহণ লাগবে, তখন সত্যি সত্যি তো তা ঘটে। বিজ্ঞানীরা তাঁদের আঁকজোখ থেকে বলেছিলেন বস্তুর বিপরীতধর্মী এক ধরনের পদার্থ আছে যাদের বলা যায় প্রতিবস্তু। পরে পরীক্ষায় সত্যি সত্যি পাওয়া গেল সে প্রতিবস্তু। বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বস্তুকে ধ্বংস করে পাওয়া যেতে পারে বিপুল শক্তি। একদিন সত্যি তা বাস্তবে ঘটল। এমন সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে বিজ্ঞানের তত্ত্বের কঠিন বাস্তবতা আর তার বিপুল শক্তিতে তো আর সন্দেহ কার চলে না। আর এই বিজ্ঞান যে শুধু মানুষের দিনানুদিন যাপনের সমস্যা নিয়ে ব্যস্তনয় তাও তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এসবের কি সমাজের ওপর কোন প্রভাব পড়ে? - সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে যে অসংখ্য উপাদান আমরা ব্যবহার করছি সে-সব বিষয়ে জ্ঞান মানুষের জীবনে নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু বিশ্বজগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানও যে মানুষের জীবনে কম প্রভাব বিস্তার করে তা তো বলা যায় না। ষোল আর সতের শতকে

বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার মানুষের চিন্তাধারার জগতে যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাকে সমসাময়িক ইউরোপে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণকালে যে মুক্তবুদ্ধির বিস্ফোরণ ঘটেছিল তা থেকে পৃথক করে দেখা চলে না। ধর্মীয় অন্ধতা আর কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছিল; ডাইনি বলে মানুষ পুড়িয়ে মারা, যুগ যুগ ধরে ধর্মযুদ্ধ চলা বন্ধ হয়েছিল। জীবাণুতত্ত্বের আবিষ্কারের ফলে পে-গ আর মহামারীতে পতঙ্গের মতো হাজার হাজার মানুষের প্রাণত্যাগের অবসান ঘটেছিল। জীবজগতের ক্রমবিকাশের তত্ত্ব মানুষের সামনে তার অস্পষ্ট সম্বন্ধে এক গভীর জ্ঞানের জগৎ আলোকিত করে তুলেছিল। বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে এসব জ্ঞান কবি-সাহিত্যিকদের হাতে প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের বর্ণনাতেও এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। বিজ্ঞান মানুষকে শুধু এই পৃথিবীকে মুক্ত স্বাধীন দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ দেয় নি, তাকে এক নতুন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নও উদ্বেলিত করেছে। সেদিনের সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন কি এই বিশ শতকের শেষে আজো সত্যি? সভ্যতার নানা জটিল সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা কি আজো তেমনি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারি?— বিশেষ করে আমরা যারা অবহেলিত, পশ্চাদপদ তৃতীয় বিশ্বের মানুষ তাদের সামনে ভবিষ্যৎ কী? সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞানের এমন কিছু নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে যা মানুষের সামনে সত্যি সত্যি এক উদ্দীপ্ত অনাগত কালের প্রতিশ্রুতি আরো উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছে।

নতুন ধরনের বস্তু : শক্তির নতুন উৎস

এককালে মানুষের নির্মাণ, হাতিয়ার প্রভৃতি প্রয়োজনের উপকরণ ছিল প্রকৃতিতে যে-সব বস্তু লভ্য সেগুলিই—কাঠ, পাথর, ব্রোঞ্জ, লোহা ইত্যাদি। উনিশ শতকে রসায়ন শাস্ত্রের অগ্রগতির ফলে নতুন নতুন ধরনের গুণাগুণযুক্ত কৃত্রিম বস্তুর উদ্ভব ঘটতে থাকে। দেখা যায়, এসব কৃত্রিম বস্তু শুধু যে প্রাকৃতিক বা খনিজ নানা বস্তুর চেয়ে বেশি টেকসই, হালকা বা সুলভ—তা নয়, তাতে রয়েছে এমন সব নতুন গুণাগুণ যা প্রাকৃতিক কোন বস্তুতে পাওয়া দুঃসাধ্য।

বিশ শতকের মাঝামাঝিও মনে করা হত, ধাতুর ব্যবহার যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে পৃথিবীর সম্ভবত ধাতুসম্পদ অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষে হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল, নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভবের ফলে ধাতুর ব্যবহার ক্রমেই কমে আসছে। যেমন, টেলিফোন যোগাযোগের জন্য আগে যেখানে এক টন তামার তারের প্রয়োজন হত সেখানে আজ মাত্র চলি-শ কেজি পরিমাণ কাঁচাতত্ত্বর সাহায্যেই সে প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে। চুলের মতো সরু বিশুদ্ধ কাচের তত্ত্বর মধ্য দিয়ে সূক্ষ্ম আলোক-স্পন্দনের মাধ্যমে এক সঙ্গে হাজার হাজার টেলিফোন সংযোগ সম্ভব হচ্ছে। এমনি সরু বিশুদ্ধ কাঁচাতত্ত্বর সঙ্গে সূক্ষ্মমাত্রায় এরবিয়াম নামে একটি ধাতু মিশিয়ে দিলে তার ভেতর ঐ এরবিয়াম পরমাণু স্পন্দিত হয়ে আলোক সঙ্কেতকে দশ হাজার গুণ পর্যন্ত বিবর্ধিত করে। এর ফলে টেলিফোন লাইনে ব্যয়বহুল অ্যামপি-ফায়ার বসাবার আর প্রয়োজন হয় না।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বেকলাইট নামে প্রথম কৃত্রিম প-স্টিক তৈরি হয়। আজ অজস্র ধরনের গুণাগুণসম্পন্ন প-স্টিক তৈরি হচ্ছে। এসব প-স্টিক অনেক ক্ষেত্রে ধাতুর চেয়ে সম্পূর্ণ হালকা, মজবুত এবং টেকসই। এখন বিজ্ঞানীদের কোন বস্তুর নতুন নতুন ব্যবহার উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে হয় না, বরং বিভিন্ন কাজের জন্য ঠিক প্রয়োজনীয় গুণাগুণযুক্ত বস্তু তাঁরা তৈরি করে নেন।

এতদিন আমরা জানতাম, অনেক ধাতব বস্তুর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ সহজেই চলাচল করে। সচরাচর কাঠ, কাচ, সিরামিক প্রভৃতি বস্তুর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না, তাই এদের বলা হয় অপরিবাহী। এসব অপরিবাহী বস্তুতে বিদ্যুতের রোধ বেশি; পরিবাহী বস্তুতে বিদ্যুতের রোধ কম। তবে সব বস্তুই বিদ্যুৎ

প্রবাহে কিছু বাধা দেয়, আর এই রোধের কারণে দীর্ঘ পথে পরিবাহীর ভেতর বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় ঘটে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে কেয়ারলিং অনেস নামে একজন ওলন্দাজ বিজ্ঞানী লক্ষ করেছিলেন, পারদ প্রভৃতি কিছু ধাতুকে ঠান্ডা করতে করতে গরম শূন্য তাপমাত্রায় (সেলসিয়াস মাপে শূন্যের নিচে ২৭৩ ডিগ্রি) কাছাকাছি নামিয়ে আনলে তাতে অতিপরিবাহিতা দেখা দেয়, অর্থাৎ তার রোধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এমন পাওয়া যায় কেবল অতি মূল্যবান তরল হিলিয়াম ব্যবহার করে-তাই এই গুণকে কোন ব্যবহারিক কাজে লাগানো হল অবাস্তব। আশির দশকের মাঝামাঝি ইউরোপ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকজন বিজ্ঞানী এমন কিছু সিরামিক বস্তু তৈরি করতে সমর্থ হলেন যা অপেক্ষাকৃত সুলভ তরল নাইট্রোজেনের চেয়ে বেশি উষ্ণতায় অতিপরিবাহী হয়ে ওঠে। তারপর অন্যান্য বিজ্ঞানী আরো এমন সব বস্তু উদ্ভাবন করেছেন যা প্রায় ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায়ও বিদ্যুতের রোধ অতিক্রম করে অতিপরিবাহিতা লাভ করে। এর ফলে ইলেকট্রনিক্স-এর ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটতে চলেছে। রোধের কারণে বিদ্যুৎশক্তির যে বিপুল অপচয় ঘটে তা দূর হলে বিদ্যুৎচালিত নানা যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের ক্ষেত্রেও ঘটবে গুণগত পরিবর্তন। নতুন ধরনের অতিপরিবাহী বস্তু নির্মাণ ছাড়াও সিরামিক জাতীয় বস্তুর আরো অসংখ্য নতুন ব্যবহার আবিষ্কৃত হচ্ছে। মোটর ইঞ্জিনে আজ ব্যবহৃত হচ্ছে অতি তাপসহ্য হালকা সিরামিক। কার্বনতন্তু, কাচতন্তু, প-স্টিকদ্রব্য, অর্ধপরিবাহী প্রভৃতি নানা গুণাগুণযুক্ত বস্তু আজ মানবদেহের অংশ নির্মাণ এবং আরো অসংখ্য প্রয়োজনে যুক্ত হচ্ছে। ঠিক তেমনিভাবে আজ উদ্ভাবিত হচ্ছে আশ্চর্য গুণাগুণযুক্ত নতুন নতুন সংকর ধাতু।

আজ যে-সব ট্রানজিস্টার এবং কম্পিউটার চিপ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তারও সৃষ্টি এক নতুন ধরনের বস্তু থেকে-সেগুলো অর্ধপরিবাহী। সাধারণ বালি থেকে সিলিকন শোধন করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার ফলে এই অর্ধপরিবাহী বিপ-ব সম্ভব হয়েছে। নতুন নতুন ধরনের চিপ কম্পিউটারের জগতে বিপুল রূপান্তর আনছে। সিলিকনের বদলে গ্যালিয়াম আর্সেনাইড প্রভৃতি নতুন ধরনের বস্তু থেকে ক্রমেই আরো শক্তিশালী, দ্রুত কার্যক্ষম চিপ তৈরি হচ্ছে। এসব কম্পিউটার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন রূপান্তর ঘটছে।

সভ্যতার অগ্রগতির ধারায় নতুন নতুন বস্তুর মতোই নানা নতুন নতুন শক্তির উৎসকে মানুষ ক্রমাগত আয়ত্ত করে চলেছে। প্রথমে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হত কাঠ। এরপর এল কয়লা আর সেই সঙ্গে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ব্যবহার। তারপর এল খনিজ তেল এবং অস্ফল্ডের্ম ইঞ্জিন। উনিশ শতকের শেষে বাষ্পীয় আর অস্ফল্ডের্ম ইঞ্জিনের শক্তি রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করল বিদ্যুৎ শক্তিতে। বিশ শতকের মাঝামাঝি এসেছে পরমাণু-শক্তি। এর মধ্যেই আজ সারা পৃথিবীর প্রায় বিশ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে পরমাণু-শক্তি থেকে।

বিংশ শতাব্দীতে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে দ্রুত, সেই সঙ্গে শিল্প-কারখানারও দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে। এই দুই বৃদ্ধির ফলাফল যুক্ত হয়ে এই এক শতাব্দীর মধ্যেই পৃথিবীতে শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার বেড়েছে প্রায় চল্লিশ গুণ। কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যাপক ব্যবহার কতকগুলো জটিল পরিবেশগত সমস্যার জন্ম দিয়েছে। দেখা দিয়েছে পরিবেশের দূষণ, আবহাওয়ার উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ‘গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া’। সেই সঙ্গে কিছু কিছু জীবাশ্ম জ্বালানি (যেমন - তেল ও গ্যাস) নিঃশেষ হয়ে আসার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পরমাণু-শক্তির ব্যবহারও গুরুতর তেজস্ক্রিয়-দূষণের আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে।

এসব কারণে আজ নতুন ধরনের জ্বালানি উৎসের সন্ধান শুরু হয়েছে। এর মধ্যে সৌর-শক্তি, পরমাণু-সংযোজনভিত্তিক ফিউশন-শক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গবেষণায় যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। বিশেষ করে জোর দেওয়া হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের দিকে। সেই সঙ্গে শক্তি সঞ্চয়, বিতরণ ও ব্যবহারের আরো দক্ষ পস্থা

উদ্ভাবন নিয়েও দুনিয়ার নানা দেশে গবেষণা চলছে। পরিবেশ দূষণ সীমিত রাখা এবং জ্বালানি সংরক্ষণের জন্য জীবাশ্ম-জ্বালানির ব্যবহার কমাবার নানা প্রযুক্তি আজ বিভিন্ন দেশে উদ্ভবিত হচ্ছে।

জৈব প্রযুক্তির সম্ভাবনা ও বিপদ

বিজ্ঞানকে মোটামুটি মাত্র দু'টি ভাগে ভাগ করতে হলে সে দু'টি হবে ভৌতবিজ্ঞান আর জীববিজ্ঞান। বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি ঘটেছে তাতে নেতৃত্ব দিয়েছে মূলত ভৌতবিজ্ঞান। বিশ শতকের শুরুতে বংশগতির তত্ত্ব উদ্ভবের ফলে পরিকল্পিত উপায়ে উদ্ভিদ আর প্রাণিদেহে উন্নয়ন সাধনে ব্যাপক অগ্রগতি সম্ভব হয়ে ওঠে। তারপর এ ক্ষেত্রে এক বৈপ-বিক পদক্ষেপ ঘটল পঞ্চাশের দশকে জীবকোষের কেন্দ্রে ক্রোমোজোম তন্তুর মধ্যে বংশগতির বাহক ডি'এন'এ' উপাদানের রাসায়নিক গঠন আবিষ্কৃত হবার ফলে। জানা গেল, উদ্ভিদ আর প্রাণীর সব গুণাগুণ নিহিত ডি'এন'এ'-র পেরঁচানো সুতোয় অসংখ্য জীনকণার মধ্যে লুকানো রাসায়নিক সংকেতে। তারপর দেখতে দেখতে দু'দশকের মধ্যে এসব সংকেতে পরিবর্তন ঘটিয়ে উদ্ভিদ আর প্রাণিদেহে মানুষের ইচ্ছেমতো গুণাগুণ সম্ভব হয়ে উঠল। সাধারণভাবে কোন জীবদেহের সাহায্য নিয়ে আর কোন বস্তু উৎপাদনের পদ্ধতিকে বলা হল জৈবপ্রযুক্তি-আর তার বিশেষ রূপ হিসেবে কোষকেন্দ্রের জীনকণায় পরিবর্তন ঘটিয়ে জীবদেহে গুণগত রূপান্তর ঘটানোকে বলা হল জীন প্রকৌশল।

কৃষি ও চিকিৎসা শাস্ত্রে জৈবপ্রযুক্তি ইতোমধ্যে বিরাট রকম পরিবর্তন আনতে আরম্ভ করেছে। ষাটের দশক থেকে ধান, গম প্রভৃতিতে সংকরায়ণের মাধ্যমে নতুন উচ্চফলনশীল জাতের উদ্ভব ঘটায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন আজ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ফলে গত তিন দশকের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে মোটামুটিভাবে দ্বিগুণ হলেও এই সময়ে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় আড়াই গুণ। তার ফলে পৃথিবীব্যাপী যেখানে খাদ্যশস্যের নীট ঘাটতি ছিল, সেখানে আজ খাদ্যশস্যের নীট উদ্ধৃত। বাংলাদেশের মতো কোন কোন দেশে যে এখনো ঘাটতি রয়েছে এটা বরং ব্যতিক্রম-আর এই ঘাটতি মিটিয়ে ফেলে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া, এমনকি উদ্ধৃত হওয়া আজকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাহায্যে অনায়াসে সম্ভব।

চিকিৎসা ক্ষেত্রেও আমরা আজ এসে দাঁড়িয়েছি বিরাট এক পালাবদলের মুখোমুখি। জীবজগতের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে এতকাল ধরে ছিল অলংঘ্য দেয়াল। পৈঁপেগাছ, বটগাছ, কেঁচো, বেড়াল, হাতি-এসব উদ্ভিদ আর প্রাণী যুগ যুগ ধরে তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিচরণ করেছে এ পৃথিবীতে। কিন্তু এই পার্থক্যের দেয়াল আজ ক্রমেই ভেঙে পড়তে আরম্ভ করেছে। জীবদেহের রহস্য উন্মোচন করে মানুষ তাদের আজ নতুন করে গড়তে শুরু করেছে। জীন-সংযোজন পদ্ধতিতে যে-কোন প্রজাতির জীবকে আজ অন্য যে-কোন প্রজাতির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া সম্ভব হয়ে উঠছে। অণুজীব থেকে বিশেষ গুণের আধার জীন ছেঁটে নিয়ে বসানো হচ্ছে কোন উদ্ভিদের দেহে, উদ্ভিদের গুণ বসানো হচ্ছে প্রাণীর দেহে। উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহের যে-সব গুণাগুণ অবাস্তব সেগুলো আমরা আজ মুছে দিতে পারি, আর তার জায়গায় যোগ করতে পারি আমাদের পছন্দমতো গুণাগুণ।

জীন-প্রকৌশলের সাহায্যে আজ তৈরি হচ্ছে নানা নতুন নতুন ওষুধ আর টিকা; আগামী দশ থেকে বিশ বছরের মধ্যে হেপাটাইটিস, সর্দি, উচ্চ রক্তচাপ, ম্যালেরিয়া, ডায়াবেটিস, ক্যানসার, হৃদবৈকল্য, পার্কিনসন্স ডিজিজ প্রভৃতি আজকের অধিকাংশ দুরারোগ্য ব্যাধি প্রতিরোধ বা নির্মূল করার মতো অস্ত্র মানুষের আয়ত্তে এসে যাবে।

জীবদেহের সব গুণাগুণ যেহেতু মূলত বংশগতির মাধ্যমে পাওয়া, কাজেই বংশগতির কৌশল ব্যবহার করে এসব গুণাগুণ বদলানোও যেতে পারে। আজকে একটি গাছের কাছে যেমন ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে আব সৃষ্টি হয়, আগামীতে হয়তো তেমন মানুষের দেহের আঙুল, ফুসফুস বা যকৃৎ বদলে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় কোন অণুজীব ব্যবহার করলেই চলবে। শুধু যে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই এভাবে বদলে দেয়া যাবে তাই নয়, বদলানো চলবে চোখের বা চুলের রং, সুরেলা বা বেসুরো গলা, এমন কি মনের ধাঁচও।

ব্যাকটেরিয়া বলতে যে এতকাল প্রধানত রোগ উৎপাদনকারী অণুজীব মনে করা হত, সে ধারণা আজ পালটে যাচ্ছে। ব্যাকটেরিয়ার ভেতর প্রয়োজনীয় জীন^১ ভরে তাকে আজ নানা উদ্ভিদে যোগ করা হচ্ছে। তাতে উদ্ভিদে জন্মাচ্ছে নানা প্রয়োজনীয় গুণাগুণ-যেমন, রোগ বা পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা, বেশি ফলন, খরা বা প-। বন সহ্য করার শক্তি। এ ধরনের পরিবর্তন উদ্ভিদে ঘটানো সম্ভব হলে প্রাণিদেহে - এমন কি মানুষের শরীরে - ঘটতে না পারার কোন কারণ নেই। একটি মানুষের দেহের সব গুণাগুণ নিহিত তার জীবকোষের ক্রোমোজোমে লুকানো লাখ খানেক জীন^২। প্রতিটি মানুষের এসব জীন^৩ লুকানো রয়েছে মোটামুটি তিনশ কোটি তথ্য। মানুষের দেহের সমগ্র জীন সমাবেশের পূর্ণাঙ্গ একটি মানচিত্র তৈরির প্রকল্প ইতোমধ্যে হাতে নেয়া হয়েছে। এতে দরকার হবে বিরাট আকারের উদ্যোগ, খরচও হবে বিপুল অঙ্কের। ‘হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট’ নামে এক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সংস্থা আজ এ নিয়ে কাজ করে চলেছে; সমগ্র প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়াবে প্রায় তিনশ কোটি ডলার। একুশ শতকের গোড়াতেই দেহের সমগ্র জীন-মানচিত্রের রহস্যভাণীর মানুষের আয়ত্ত হবে বলে আশা করা যায়। তখন প্রতিটি জীনের পরিচয়, গুণাগুণ আর অবস্থান এসে যাবে মানুষের নখদর্পণে। কোথায় কোন জীনের অঙ্গটির কারণে একজন মানুষ বর্ণাঙ্ক বা দুরারোগ্য রক্তাঙ্কতার শিকার অথবা তার হৃদবৈকল্যের বা বিশেষ কোন ধরনের ক্যানসারের প্রবণতা আছে তা জানা যাবে সহজেই; আর তখন সেই জীন বা জীন-সমষ্টি বদলে ফেলে তাকে এই বিপদের আশঙ্কামুক্ত করা তেমন দুঃসাধ্য হবে না।

উদ্ভিদের জীনে রদবদল ঘটাবার একটা ফল হবে এই যে, বিভিন্ন দেশের চাষাবাস বদলে যাবে। শীতের দেশের ফসল আর শাক-সবজি জন্মানো যাবে গরমের দেশে। গরমের দেশের শাক-সবজি, ফলমূল জন্মাবে শীতের দেশে। কোথায় কোন গাছ লাগানো হবে তা নির্ভর করবে চাষীদের ইচ্ছার ওপর। এমনভাবে ফসল বাছাই করা হবে যাতে তা সূর্যালোকের সুবিধে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে; তাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়বে বহু গুণে। তাছাড়া ফসলের পুষ্টিগুণও বাড়ানো যাবে। হয়তো শাক-সবজি থেকেই পাওয়া যাবে মাংসের মতো প্রোটিন, স্বাদও বাড়ানো চলবে পছন্দমতো। সে-সব ফসল ফলাতে সার আর কীটনাশক লাগবে খুব কম; ফসল সংরক্ষণ করা যাবে দীর্ঘকাল। ফসল পরিবর্তনের ফলে পশুপাখিতেও পরিবর্তন দেখা দেবে; সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটবে নানা দেশের মানুষের জীবনযাত্রার ধরনে।

কিন্তু এসব নতুন ধরনের সংকর ফসলের একটা সমস্যা এই যে, এগুলোর বীজ ব্যবহার করলে পরবর্তী প্রজন্মে ছবছ একই ধরনের ফল পাওয়া যায় না। সে জন্য যে-সব বড় বড় কোম্পানি এসব ফসল উদ্ভাবন করেছে তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে নতুন মূলবীজ। অর্থাৎ নতুন জাতের সব ফসল ক্রমেই কৃষিগত হয়ে পড়তে পারে কিছু একচেটিয়া মালিকের হাতে। এমনভাবে একচেটিয়া কর্তৃত্বের কবলে পড়বে নতুন ধরনের সব পশুপাখিও। এসব পরিবর্তনের মধ্যে অনেকে আরো নানা বিপদের সম্ভাবনা দেখছেন। উদ্ভিদ আর প্রাণিদেহে যে-সব পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে তা কি শেষ পর্যন্ত সবই মানুষের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে? ধরা যাক, কোন আলুর গাছে জীন বদলে দেয়া হয়েছে। তার ফলে সেই আলুর ফুল থেকে রেণু আলু জাতীয় অন্য গাছে ছড়িয়ে পড়ে তাতে যে-কোন অনাকঙ্কিত পরিবর্তন ঘটিয়ে বসবে

না তার নিশ্চয়তা কী? যে-সব অণুজীব বা ভাইরাসের দেহে বিজ্ঞানীরা আজ জীনগত পরিবর্তন ঘটচ্ছেন তা থেকে ওইসব জীন যদি অন্য অণুজীব বা ভাইরাসের দেহে চালান হয়ে যায় তাহলে তার ফল কি হবে? তাছাড়া মানবদেহের ত্রুটি মেরামতের জন্য বা উন্নয়ন সাধনের জন্য জীনগত যে-সব রূপান্তর ঘটানো হবে তা যে সবই মানুষের জন্য শেষ পর্যন্ত কল্যাণকর হবে তারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই। এসব নীতিগত প্রশ্ন নিয়ে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানী সমাজ ও অন্যান্য মহলে আজ তীব্র বিতর্ক চলছে। অবশ্য অতীতে বিজ্ঞানের অন্যান্য অনেক আবিষ্কার নিয়েও রক্ষণশীলরা প্রথম প্রথম নানা রকম ভীতিজনক আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে, তার জন্য শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেমে থাকে নি।

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি

জ্ঞান লাভের জন্য তথ্য আহরণ একটি প্রাথমিক প্রয়োজন। মানুষ চিরকালই তার চারপাশের প্রকৃতি থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছে, নানা সংকেত ও ভাষার ব্যবহার করে সে-সব তথ্যকে পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় করেছে। মুখের ভাষা থেকে ক্রমে ক্রমে উদ্ভব ঘটেছে লিখিত ভাষার, তারপর ছাপাখানার-এভাবে তথ্য বিনিময়ের বিস্তার বেড়েছে। কিন্তু মাত্র গত কয়েক দশকের মধ্যে ইলেকট্রনিক্স, টেলিযোগাযোগ ও কম্পিউটারের সংযোগের ফলে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক বৈপ-বিক রূপান্তরের সূচনা ঘটেছে। এসব প্রযুক্তির সাহায্যে অকল্পনীয় পরিমাণ তথ্যকে মানুষ আজ একযোগে সম্বল ও ব্যবহার করতে পারছে; নানা দেশের ক্রমবর্ধমান তথ্যসম্পদ যে-কোন মানুষের কাছে লভ্য হয়ে উঠছে।

বিপুল পরিমাণ তথ্য দ্রুত প্রক্রিয়াজাত করার জন্য কম্পিউটারের উদ্ভব ঘটেছে মাত্র চল্লিশ দশকের শেষে। প্রথম প্রথম কম্পিউটার ছিল বিশাল আকারের, তাতে বিদ্যুৎ ব্যবহার হত বিপুল আর ব্যয়ও ছিল বিরাট অঙ্কের। কিছুদিনের মধ্যে ট্রানজিস্টার ইলেকট্রনিক চিপ উদ্ভাবনের ফলে কম্পিউটারের আকার ছোট হতে আরম্ভ করে, তার শক্তিও বাড়ে। সত্তরের দশকের শেষ ভাগ থেকে কম্পিউটার ঘরে ঘরে আসন গ্রহণ করতে থাকে। আজ কম্পিউটারের সঙ্গে যোগ হয়েছে ভিডিও, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃত্রিম উপগ্রহ, লেজারযুক্ত কমপ্যাক্ট ডিস্ক। মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন করা যাচ্ছে। তথ্য ব্যবস্থায় এক বৈপ-বিক রূপান্তর ঘটেছে।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও এর ফলে পরিবর্তন আসছে। উন্নত দেশে ঘরকন্নার অনেক কাজ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কম্পিউটার ব্যবস্থা দিয়ে। অনেক যানবাহন চলছে স্বনিয়ন্ত্রণে। ব্যাঙ্কে মানুষের বদলে কাজ করে দিচ্ছে কম্পিউটার, শিল্প-কারখানায় মানুষের কাজ করছে রোবট। শ্রমসাধ্য কাজ থেকে মানুষ সরে গিয়ে যুক্ত হচ্ছে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করার কাজে। আগামী দিনে আরো অনেক বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটবে। টেলিফোনে হয়তো দেখা যাবে পরস্পরকে। টেলিফোন স্থান পাবে হাতঘড়িতে, হয়তো টাই-পিনে; আপনা থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের দোভাষী হয়ে কথা তরজমা করে দেবে। টেলিফোনের মাধ্যমেই হয়তো ডাক্তার রোগীর তাপমাত্রা, রক্তচাপ, কার্ডিওগ্রাম-এসব তথ্য পেয়ে যাবেন; তারপর যথাবিহিত চিকিৎসার নির্দেশ দিতে পারবেন। এককালে জনবসতি গড়ে উঠত যে-সব জায়গায় যোগাযোগের সুবিধে ছিল তেমন জায়গায়-যেমন নদীর তীরে, রাস্তার সংযোগস্থলে। আজ ইলেকট্রনিক্স যোগাযোগের কল্যাণে যে-কোন জায়গায় জনবসতি গড়ে উঠা সম্ভব হয়ে উঠেছে। এমনকি নগরকেন্দ্রে সব অফিস স্থাপন করতে হবে এ ধারণাও আজ বদলে যাচ্ছে। কম্পিউটার যোগাযোগের মাধ্যমে বাসস্থান ও কর্মস্থানের পার্থক্য ক্রমেই ঘুচে যেতে আরম্ভ করেছে।

এ ধরনের অগ্রগতির ফলে তথ্যব্যবস্থা আজ হয়ে উঠেছে আধুনিক সমাজের ঝুঁকুকেন্দ্রে। এই ঝুঁকুকেন্দ্রে

শক্তিশালী করার ওপরই নির্ভর করছে শিক্ষা, গবেষণা, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন- এমনকি সমাজ ও সভ্যতার সংগঠন। এই প্রযুক্তি যে-সব দেশের আয়ত্ত হবে তারা অধিকারী হবে বিপুল পরিমাণ শক্তির। অন্য দেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগও তাদের আয়ত্ত হবে। এতকাল কৃষিপণ্য, খনিজ ও শক্তি ছিল কোন দেশের অর্থনীতির প্রধান উপকরণ। আজ ক্রমেই সে অবস্থা বদলে যাচ্ছে। সারা পৃথিবী ক্রমাগত যোগাযোগের জালে পরস্পর সন্নিহিত হয়ে ওঠায় তথ্য হয়ে উঠছে অর্থনীতির প্রধান কাঁচামাল। তথ্যনির্ভর এক নতুন ধরনের সভ্যতার দিকে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে। আর যেহেতু তথ্য সঞ্চয়ের কোন বস্তুগত সীমারেখা নেই কাজেই এ ক্ষেত্রে অগ্রগতিরও কোন সীমারেখা নেই।

পরিবেশ ভারসাম্য ও প্রকৃতি সংরক্ষণ

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি শুধু উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে না, মানুষের জন্য নানা নতুন নতুন সমস্যাও জন্ম দিচ্ছে। বিগত তিন-চার দশকে সারা পৃথিবীতে পরিবেশ সম্পর্কে নতুন সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবী জুড়ে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং বেরোয়া শিল্প-কারখানা বিস্তারের ফলে পৃথিবীর বস্তুসম্পদ যেভাবে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এবং পরিবেশের দূষণ সর্বব্যাপ্ত হয়ে পৃথিবীকে মনুষ্যবাসের অযোগ্য করে তুলছে তা এই শতকের মাঝামাঝি থেকে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পঞ্চদশের দশকে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন আরম্ভ হলে সমগ্র পৃথিবীকে বাইরে থেকে দেখা এবং বায়ুমন্ডলের অসংখ্য মাপজোখ একযোগে নেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে। এসব মাপবোখের সঙ্গে কম্পিউটার প্রযুক্তির যোগ ঘটায় ফলে বিপুল পরিমাণ তথ্যকে অল্প সময়ে প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব হয়ে ওঠে। ষাটের দশকের শেষে মানুষ যখন নভোযানের ছোট ভেলায় চড়ে পৃথিবী ছাড়িয়ে নভোলোকে যাত্রা করে তখন মহাবিশ্বের বিশাল পটভূমিতে পৃথিবীও যে একটি সীমাবদ্ধ পরিসরের স্বনির্ভর সপ্রাণ ভেলা-এ সত্য মানুষের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞানীরা আজ জেনেছেন যে, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং আরো ক’টি এমন গ্যাস আছে যেগুলি সূর্যের হ্রস্ব মাপের আলোকরশ্মিকে পৃথিবীর ওপর পড়তে বাধা দেয় না, কিন্তু সে রশ্মি যখন পৃথিবী থেকে বড় মাপের তাপরশ্মি হিসেবে প্রতিফলিত হয় তখন তাকে শোষণ করে নেয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পৃথিবীতে ব্যাপক আকারে কয়লা প্রভৃতি খনিজ জ্বালানি ব্যবহার এবং বন নিধনের ফলে বায়ুমন্ডলে এ ধরনের তাপশোষক গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে উঠছে। তাতে বায়ুমন্ডলে উষ্ণতা ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। এই প্রভাবকে বলা হচ্ছে ‘গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া’। বিশ শতকের মধ্যে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে আধ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে। এর জন্য পৃথিবীর আবহাওয়ার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। আগামীতে এই উষ্ণতা বৃদ্ধির হার দ্রুত হবে, পৃথিবীর গড় উষ্ণতা আরো বাড়বে; এতে পৃথিবীর জলবায়ুতে বড় রকম ওলট-পালট ঘটবে-বিভিন্ন দেশে কৃষির ওপর তার ব্যাপক প্রভাব পড়বে। সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত হয়ে ফুলে ওঠে নিচু বদ্বীপ অঞ্চলের দেশগুলিকে ডুবিয়ে দেবে। একুশ শতকের প্রথমভাগেই বাংলাদেশ, মিশর, ভিয়েতনাম প্রভৃতি বেশ কিছু দেশ এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিপদের সম্মুখীন হবে। এমনি আরেক সমস্যার কথা আজ বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাওয়া তথ্যের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। সে হল, পৃথিবীর উঁচু বায়ুমন্ডলে ওজোন গ্যাসের একটি হালকা স্ভ্র আছে, এটি সূর্যরশ্মির অতিবেগুনি অংশ শুষে নিয়ে পৃথিবীর প্রাণী ও উদ্ভিদকুলকে এই তীব্র রশ্মিতে ঝলসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু আজকাল রেফ্রিজারেটর ও অন্যান্য শিল্পকাজে সি’এফ’সি এবং অন্য আরো কিছু এমন গ্যাস ব্যবহৃত হয় যা উঁচু আকাশে উঠে এই ওজোন স্ভ্র ধ্বংস করে দিচ্ছে। দক্ষিণ ও উত্তর মেরু এলাকার ওজোন স্ভ্রের এর মধ্যেই বিরাট ফোকর দেখা দিয়েছে। ফল হিসেবে আগামী কয়েক বছরে

পৃথিবীতে ক্যানসার ও অন্যান্য রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। পরিবেশের দূষণ, বন-বিনাশ এবং আরো নানা কারণে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি আজ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। এটাও পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হবার একটি অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে। জীবজগতের বৈচিত্র্য নষ্ট হলে শুধু যে মানুষের জীবনযাত্রার মানেরই অবনতি ঘটবে তা নয়, মানুষের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে।

এসব আবিষ্কারের ফলে আজ দুনিয়াজোড়া উদ্যোগ চলছে এমন উন্নয়ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করার যাতে পরিবেশের ওপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া না পড়ে; পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না হয় এবং পরিবেশের সম্পদ আগামী প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা যায়।

তৃতীয় বিশ্বে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি

এসব দৃষ্টান্ত থেকে এটা স্পষ্ট যে, আগামী দিনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিকাশের আজ এক বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। তার প্রভাব তৃতীয় বিশ্বের ওপর কতখানি বা কীভাবে পড়বে সে প্রশ্নও স্বাভাবিকই দেখা দেয়। পৃথিবীতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিপুল বিকাশ আজ সন্দেহাতীতভাবে দৃশ্যমান। কিন্তু দৃশ্যমান শুধু এই বিকাশের বিপুলত্ব নয়, এর অসমতাও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পশ্চিম জার্মানি প্রভৃতি গুটিকতক দেশে গড়পড়তা মাথাপিছু আয়ের হার আজ বছরে পনের হাজার ডলারের ওপর। কিন্তু সেই সঙ্গে বাংলাদেশ, ভারতসহ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ রয়েছে চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে-তাদের মাথাপিছু আয় বছরে সাড়ে তিনশ ডলারের কম। উন্নত দেশগুলোতে বিজ্ঞানের আশ্চর্য বিকাশের ফলে ভোগ্যপণ্যের যে অভূতপূর্ব প্রাচুর্য সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ভোলা যায় না, পৃথিবীতে আশি কোটির বেশি লোক আজ অনাহারের শিকার, একশ কোটি আজো নিরক্ষর। উন্নত দেশগুলো যেখানে প্রতিদিন অস্ত্রসজ্জার জন্য ব্যয় করে দু'শ কোটি ডলার আর উত্তেজক পানীয়ের জন্য ত্রিশ কোটি ডলার, সেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৮০ জন মানুষের কাছে জীবনধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ পানি আজো লভ্য নয়।

মোট কথা, মাত্র গুটিকতক দেশে পৃথিবীর মোটামুটি এক-চতুর্থাংশ মানুষের হাতে আজ বন্দি হয়ে আছে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা মানুষের প্রায় সমগ্র বিজ্ঞানের ঐতিহ্য আর সম্পদ। প্রতি বছর পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়নে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তার শতকরা ৯৫ ভাগের ওপর ব্যয় করে এই দেশগুলি; আর উন্নয়নশীল দেশের বাকি তিন-চতুর্থাংশ মানুষের জন্য ব্যয় হয় বাকি মাত্র শতকরা ৫ ভাগ। সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর জ্ঞান তাই মূলত কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে উন্নত দেশগুলোর হাতে। এই সমস্যাটি আজ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি দুনিয়াজোড়া এর বিস্ময়। আর এ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন দেশে দেশে বিজ্ঞানী আর শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা। দুনিয়ার তিন-চতুর্থাংশ মানুষকে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অবারিত আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত রেখে সত্যি কি পৃথিবীর কল্যাণের কথা চিন্তা করা যায়? উন্নত দেশগুলো বিজ্ঞানের অসম ও বৈষম্যমূলক বিকাশের ফলে যে-সব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বা পরিবেশগত সমস্যার জন্ম দিচ্ছে তার দায় উন্নয়নশীল দেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত বা নীতিসম্মত? -আর তার চেয়েও যে প্রশ্ন আজ বড় হয়ে উঠেছে সে হল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ আজ যত ব্যাপ্তি লাভ করছে উন্নত আর উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বিভেদ না কমে যেন ততই আরো বেড়ে চলেছে; মানুষের জীবনযাত্রার মানে শুধু নয়, বিকাশের সম্ভাবনাতেও এই বৈষম্য ক্রমেই দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠছে। কিছুদিন আগে প্রফেসর আবদুস সালাম তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন-পৃথিবীতে মানুষ আছে দু'জাতের। এক জাতে রয়েছে উন্নত বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ বাসিন্দা। তারা বাস করে পৃথিবীর স্থলভাগের দুই-পঞ্চমাংশ এলাকায় আর নিয়ন্ত্রণ

করে পৃথিবীর ৮০ শতাংশ সম্পদ। আর দ্বিতীয় জাত হল বাকি তিন-চতুর্থাংশ মানুষ যারা বাস করে পৃথিবীর তিন-পঞ্চমাংশ এলাকায়। এরা হল ‘মুসতাজেফিন’- অর্থাৎ বঞ্চিত মানুষের দল। এই দু’জাতের মানুষের মধ্যে প্রাধান্য পার্থক্য হল তাদের আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা আর উদ্দীপনায়-যার উৎস হল মূলত আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্ঞান ও প্রয়োগ-কুশলতার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যকার পার্থক্য। উন্নয়নশীল দেশগুলির মানুষের ভাগ্যকে যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁদের আজ এক মৌলিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে নিতে হবে-এই বঞ্চিতদের তাঁরা আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সৃষ্টি, অর্জন ও প্রয়োগের সুযোগ দিতে চান কি চান না।

প্রফেসর সালাম যে দু’ধরনের মানুষের কথা বলছেন তাদের মধ্যে এমনি পার্থক্য যে চিরকাল ছিল তা নয়। বরং আজ যারা উন্নয়নশীল দেশ বলে পরিচিত, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে তাদেরই কোন কোনটি সভ্যতার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে পথ দেখিয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে। কিন্তু উত্তরের কিছু দেশ আজ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাতিয়ার অর্জন করে এগিয়ে গিয়েছে দক্ষিণের অধিকাংশ দেশের চেয়ে। সে-সব দেশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ যত বেশি হয়েছে, তত পিছিয়ে পড়েছে দক্ষিণের দেশগুলি; তত বিশাল হয়েছে উত্তর আর দক্ষিণে দু’ধরনের দেশের মধ্যে পার্থক্য। আজকের উন্নত প্রযুক্তির যুগে এই পার্থক্য আরো বৃদ্ধির সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলি জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী পরিমাণ সম্পদ বিনিয়োগ করে তার হিসেব নিলে তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার কারণ অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গড়পড়তা হিসেব ধরলে দেখা যায় উন্নত ও উন্নয়নশীল দু’ধরনের দেশই তাদের মোট দেশজ উৎপাদনের হ’শতাংশের মতো ব্যয় করে সামরিক খাতে। শিক্ষাখাতে উন্নত দেশগুলির ব্যয়ের হার পাঁচ শতাংশের মতো, উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে চার শতাংশের কম। স্বাস্থ্যখাতে উন্নত দেশগুলির গড় ব্যয় পাঁচ শতাংশের কাছাকাছি, উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে দেড় শতাংশের মতো। কিন্তু বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই পার্থক্য যত বিশাল, এমন আর কোন ক্ষেত্রে নয়। উন্নত দেশগুলি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয় করে মোট দেশজ উৎপাদনের দু থেকে তিন শতাংশ। উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এই ব্যয়ের হার এর মাত্র দশ ভাগের একভাগ। বাংলাদেশেও এ খাতে ব্যয় এমনি শেষের সারিতে-মোট দেশজ উৎপাদনের ০.৩ শতাংশের মতো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এত কম হারে অর্থ বিনিয়োগ করে আনুর্ভূতিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার আশা দুরাশা মাত্র।

অথচ আজ এ ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলি নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা না করলে আনুর্ভূতিক প্রতিযোগিতায় কেবলই পিছিয়ে পড়া আর পরনির্ভরশীল হয়ে থাকা তাদের একমাত্র ভবিতব্য হয়ে দাঁড়াবে। পাশ্চাত্যের কোন কোন উন্নত দেশ আজ ব্যাপক সমরসজ্জার নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করে তাদের সামরিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেসামরিক উৎপাদনে লাগাবার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তাদের ভোগবাদী অর্থনীতিকে সংযত না করলে যে পরিবেশের ব্যাপক বিপর্যয় রোধ করা দুঃসাধ্য হবে এ বিষয়েও এসব দেশে আজ সচেতনতা গড়ে উঠছে। কিন্তু তবু উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং জীবনযাত্রার ধারায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকারের তালিকায় একবারে প্রথম সারিতে বসাতে না পরলে আগামী দিনে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রগতির পথে এগোনো তাদের জন্য দুঃসাধ্য হবে।

তৃতীয় বিশ্বের নেতৃস্থানীয়দের অনেকের ধারণা, উন্নত দেশ থেকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ধার করে অথবা খয়রাত হিসেবে নিয়ে তাঁরা একুশ শতকে পাড়ি জমাতে পারবেন। কিন্তু গত কয়েক দশকের উন্নয়ন সাহায্যের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ আশা দুরাশা মাত্র। প্রথমত, উন্নত দেশগুলির শিল্পপতিরা তাদের

মুনাফার স্বার্থে অনুন্নত দেশগুলিকে সত্যিকার বিজ্ঞান-প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ব্যাপারে সাহায্য দিতে মোটেই আগ্রহী নয়। দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্য দেশে যে-সব গবেষণা পরিচালিত হয় তা প্রাধানত সে-সব উন্নত দেশের জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে- তাদের সে কর্মসূচি মূলত তাদেরই আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন আজকের পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের ব্যাধির অর্ধেকই দেখা যায় প্রধানত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, পীতজ্বর প্রভৃতি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক লোক মৃত্যু বরণ করে; কিন্তু এসব রোগের টিকায় তেমন মুনাফা নেই বলে পাশ্চাত্য দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের রোগ সম্বন্ধে গবেষণায় অর্থবিনিয়োগে আগ্রহী নয়। সারা পৃথিবীতে চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণায় যত অর্থ ব্যয় হয় তার মাত্র তিন শতাংশ বরাদ্দ এসব গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের জন্য। এ কারণে পৃথিবী থেকে এসব রোগ নির্মূল করা বিলম্বিত হচ্ছে।

সারা পৃথিবীতে আজ কত প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে তার নির্ভরযোগ্য হিসেব পাওয়া দুঃসাধ্য। আনুমানিক হিসেব হল ত্রিশ লাখ থেকে এক কোটি। এর মধ্যে মাত্র চার লাখ প্রজাতির উদ্ভিদ এবং এগার লাখ প্রজাতির প্রাণী মিলিয়ে মোটামুটি পনের লক্ষ প্রজাতির জীব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে জানেন। প্রজাতির সংখ্যা সম্পর্কে অনিশ্চয়তার একটি কারণ হল, এসব প্রজাতির অধিকাংশের আবাস হল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে-অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের দেশে। এসব উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি শুধু বংশগতির ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার নয়, মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় নানা রাসায়নিক উপাদানেরও বিপুল ভাণ্ডার। রসায়ন শাস্ত্রে বিপুল অগ্রগতি সত্ত্বেও আজও সব ওষুধের এক-চতুর্থাংশের মূল উপাদান আসে গাছ-গাছড়া থেকে। উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের রহস্যের শতকরা এক ভাগও এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে উদ্ঘাটিত হয় নি। অথচ শুধু সাম্প্রতিককালেই কফি, কোকো, পাট, চা, রাবার এমনি কিছু উদ্ভিদের ব্যবহার যে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে কী বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে তা তো আমরা আমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

তৃতীয় বিশ্বের নেতৃস্থানীয়দের অনেকের ধারণা, আমরা শুধু বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহারিক অবদানকে কাজে লাগাবার জন্য নেব, কিন্তু সেজন্য মৌলিক বিজ্ঞানের বা গবেষণার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আজ এটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ ধারণা একান্ডুই ভ্রান্ত। কেননা আজকে যা মৌলিক বিজ্ঞান বলে গণ্য, আগামী দিনে তাই দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য প্রযুক্তি। আজকের দিনে যে-সব দক্ষ প্রতিযোগিতামূলক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে তার সবই অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞাননির্ভর। কাজেই দেশজ সনাতন নানা প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু সেই সঙ্গে নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উদ্ভাবন, বিস্তার ও প্রয়োগের ক্ষমতা আয়ত্ত না করে কোন দেশের পক্ষেই আজ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হওয়া এবং আধুনিক জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্ঞান আয়ত্ত করার জন্য শুধু গুটিকতক উচ্চমানের বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করলেই চলতে পারে, এই পুরনো ধারণাও আজ ক্রমেই অচল হয়ে উঠেছে। পরিবার পরিকল্পনা, উন্নত কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগ, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেখা গেছে সমগ্র জনসমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও চেতনার বিস্তার ছাড়া আজকের দিনের বিজ্ঞান-প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবীতে কোন জনগোষ্ঠীর টিকে থাকা দুঃসাধ্য। সে জন্য ব্যাপক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জনসম্পদের বিকাশ ঘটাতে হবে; শিক্ষা ব্যবস্থায় একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে বিজ্ঞানকে অঙ্গভুক্ত করতে হবে, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষায় বিজ্ঞানকে প্রধান ভূমিকায় বসাতে হবে। শুধু শিক্ষা ব্যবস্থায় নয়, তার বাইরেও সমগ্র জনসমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত না হলে সে দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। আজকের দিনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কল্যাণকর শক্তি ও সম্ভাবনা যেমন বিস্মৃত হচ্ছে তেমনি বাড়ছে তার অকল্যাণের ক্ষমতা।

শিল্প প্রসারের ফলে পরিবেশ দূষণ বড়ছে, জৈবপ্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে কৃষিতে এবং জীবদেহের ওপর যে প্রভাব পড়তে পারে তাতে নানা নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে; যুদ্ধাস্ত্রের বিস্ফোরণের ফলে সামরিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিশ্বে বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এসব বিপজ্জনক প্রভাবকে প্রতিরোধ করে কল্যাণ ও প্রগতির পথে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নেওয়া কেবল এক আধুনিক বিজ্ঞানের সংস্কৃতিতে লালিত সচেতন জনসমাজের পক্ষেই সম্ভব।

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি আজ মানুষের সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই ভবিষ্যতে সংকট আর সম্ভাবনা একবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। জন-বিচ্ছোরণ ও খাদ্য সমস্যা এখনও রয়েছে। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রমাণ করেছে এসব সমস্যার সমাধান মানুষের অসাধ্য নয়। ইতোমধ্যে অনেক দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্ফির্ড্রমিত হতে হতে একবারে শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে; আগামীতে অন্যান্য দেশেও নিঃসন্দেহে তা ঘটবে। সমগ্র পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য সমস্যা আজ আর তেমন কোন সমস্যা নয়। পরিবেশের অবনতি বিশ্বময় যে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে তার সমাধানও আজ মানুষের আয়ত্ত। গত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা প্রমাণ দেয় যে, পারমাণবিক যুদ্ধ ও বিশ্বধ্বংসের আশঙ্কাকেও সচেতন বিশ্বসমাজের পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব। সেই সঙ্গে এ সত্য ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি আজ যে-সব সমস্যার সৃষ্টি করেছে তার সমাধান শুধু বিজ্ঞান-প্রযুক্তি থেকে পাওয়া দুঃসাধ্য হবে। রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে দেখা দিচ্ছে নানা জটিলতা; বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রয়োগ নিয়েও উদ্ভব ঘটেছে নানা নৈতিক সমস্যার। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অসম বিকাশের ফলে বিশ্বব্যাপী মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করার সমস্যা ক্রমেই এক প্রধান আনুর্জাতিক কর্মসূচির অঙ্গ হয়ে উঠছে। আগামী দিনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবন আরো সমৃদ্ধ হবে- একথা বলা যেতে পারে; কিন্তু আরো যে সহজ ও সরল হবে তা বলা শক্ত। সম্ভবত জীবন সহজ না হয়ে বরং আরো জটিল হবে। কিন্তু কোন কল্পলোকের প্রত্যাশায় না থেকে এই জটিলতার জন্য প্রস্তুত হওয়াই হবে বাস্তবসম্মত পন্থা। সংকটকে অতিক্রম করে আগামী দিনের সম্ভাবনার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সামনে এ ছাড়া কোন সহজ সরল পথে আগামী শতাব্দীর দিকে এগিয়ে যাবার উপায় নেই। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে কঠোর সাধনার পথে এগিয়ে যাওয়াই তাদের সম্মানজনক অশির্ভুত রক্ষা ও বিকাশের একমাত্র পথ।*

* প্রবন্ধটি ঐতিহ্য সংরক্ষণ পরিষদ - চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত অধ্যাপক আবুল ফজল স্মারক বক্তৃতা হিসেবে ১৯৯০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমিতে পঠিত। প্রায় এক যুগ আগে লেখা এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও অশির্ভূত ভাবনার মধ্যে সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে বলে লেখাটি পুনঃপ্রকাশ করা হলো। - সম্পাদক

শিক্ষায় অর্থায়ন – একটি পর্যালোচনা

ড. মনজুর আহমদ *

বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে অর্থায়ন অর্থাৎ সম্পদ সংগ্রহ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য-

১. স্বল্প-ব্যয় ও স্বল্প ফলাফলের একটি ব্যবস্থা

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা অতি কম খরচে পরিচালিত হয়। অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের তুলনায়ও এখানে শিক্ষাখাতে ব্যয় কম। এ অবস্থার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে দেশের মৌলিক শিক্ষা অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা কর্মসূচির ব্যাপক বিস্তারে। এধরনের বিস্তার ঘটেছে জিএনপির অতিক্ষুদ্র অংশ ব্যয় করে। ব্যয়ের এই হার দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে কম। শিক্ষাখাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের খরচ সবচেয়ে কম (২০০০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত গড়ে জিএনপির ২.২%)। বার্ষিক প্রাথমিক শিক্ষাখাতে শিক্ষার্থী প্রতি ব্যয় মাত্র ১৩ ডলার। বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষায় (যার আন্ততায় শিক্ষায় শতকরা ৯০ ভাগ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী) এই ব্যয় ১৬ ডলার। স্বল্প-মাথাপিছু ব্যয় সম্ভবতার কারণ হতে পারে না, এতে শিক্ষার্থীদের শিখন-অর্জন, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার মান গুরুত্বপূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. সরকারি অর্থায়নের প্রাধান্য

শিক্ষাখাতে ব্যয় বহুলাংশে সরকারি অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল। গত এক দশকে সরকারিভাবে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও অবকাঠামো বা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় নি। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেসরকারি খাতের ওপর নির্ভর করা হচ্ছে। রেজিস্টার্ড বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৯০ ভাগ সরকারি খাত থেকে আসে। এছাড়াও এডহক ভিত্তিতে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও মেরামত খরচ সরকারিভাবে বহন করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়া হয়। বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম এর আন্ততায় পড়ে না। মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ডিগ্রি কলেজগুলোর একটি বিশাল অংশ বেসরকারি। এ প্রতিষ্ঠানগুলোও শিক্ষকদের বেতনের ক্ষেত্রে সরকারি আর্থিক সাহায্য পায়। শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলো এই সরকারি অর্থায়ন ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে না। সরকারি অর্থায়ন এবং স্থানীয় কমিটি কর্তৃক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মান উন্নয়ন এবং মানের মাপকাঠি স্থাপনে একটা শক্তিশালী ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এই ব্যবস্থাটি ফলপ্রসূ হয় না সরকারের দুর্বল তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর অদক্ষতার কারণে। এরই সাথে যুক্ত হয়েছে শিক্ষাব্যবস্থায় রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্টতা। যাই হোক না কেন সরকারি অর্থায়ন এবং এর ফলপ্রসূ ব্যবহার শিক্ষার উন্নয়নের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

৩. অর্থায়ন ব্যবস্থায় ব্যক্তি বা পরিবার খাতের বিশিষ্ট ভূমিকা

* পরিচালক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

শিক্ষাখাতে সরকারি অর্থায়নের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করা হলেও শিক্ষাব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষার্থী বা তার পরিবার বহন করে। অর্থায়ন নীতি প্রণয়নের সময় এই ব্যাপারটি বিবেচনায় আনা হয় না। এডুকেশন ওয়াচের (EW) তথ্য অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষায় বাৎসরিক মাথাপিছু ১০০০ টাকা পারিবারিকভাবে ব্যয় করা হয়। এর একটি বড় অংশ খরচ হয় প্রাইভেট পড়ানোয়। পারিবারিক ব্যয় সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যে দেখা যায় যে, বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা বলা হলেও বাস্‌ডব চিত্র আলাদা। শিক্ষার অন্যান্য স্তরের শিক্ষার্থীর প্রবেশ নির্ভর করে তার পরিবার তার জন্য কতটা ব্যয় করতে পারবে তার ওপর। (বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিক্স, পারিবারিক ব্যয় জরিপ, ১৯৯৬: এডুকেশন ওয়াচ - ২০০০)। প্রাথমিক শিক্ষায় পারিবারিক ব্যয় প্রায় সরকারি রাজস্ব ব্যয়ের সমান। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী-প্রতি বেসরকারি ব্যয় সরকারি ব্যয়ের চারগুণ। যদিও প্রায় সব ডিগ্রি কলেজগুলোর কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতনের জন্য সরকারি সাহায্য পায়। এরপরও বেসরকারি ব্যয়ের পরিমাণ সরকারি খরচের চেয়ে অনেক বেশি। একমাত্র সরকারি অর্থানুকূলে পরিচালিত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরকারি অর্থায়ন বেসরকারি ব্যয়কে ছাড়িয়ে যায়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত টিউশন ফি-র ওপর নির্ভরশীল। এখানে শিক্ষার্থীর পরিবারই শিক্ষা-ব্যয় বহন করে। অন্যদিকে সরকারি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষুদ্র উপ-খাতে সরকারি অর্থায়ন বেসরকারি ব্যয়ের তুলনায় বেশি। এই চিত্র পাল্টে যাবে অর্থাৎ বেসরকারি ব্যয় অনেক বেশি দেখা যাবে, যদি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশ এবং চাকুরি-কালীন প্রশিক্ষণের ব্যাপারটি বিবেচনায় আনা যায়। এসব কর্মকাণ্ডের নির্ভরযোগ্য তথ্য সহজলভ্য নয়। (ড. মনজুর আহমদ ২০০০)

শিক্ষার বিভিন্ন উপখাতে পারিবারিক ব্যয়ের পরিমাণ, শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহার সম্পর্কিত নীতির ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বেসরকারি খাতে সম্পদ সংগ্রহ এবং ব্যবহারের কৌশল প্রণয়ন একটি বিবেচনার ব্যাপার। এর সাথে বিবেচনায় আনা দরকার বেসরকারি খাতের কার্যকারিতা এবং শিক্ষায় সমতা আনয়নে সরকারি ও অন্যান্য অর্থ-উৎসের সমন্বিত পরিকল্পনা। শিক্ষা সম্পর্কিত সেবা প্রদান, নীতি ও কর্মসূচি উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি সকল প্রচেষ্টায় অংশীদারিত্ব কিভাবে হবে তা-ও বিবেচ্য।

৪. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও অর্থায়নে অসামঞ্জস্য

শিক্ষা বিস্তার ও মানোন্নয়ন সম্পর্কিত জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষাখাতে মোট জাতীয় ব্যয়, বিশেষত সরকারি বরাদ্দ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে। বিশ্বব্যাংকের হিসেবে (জিডিপি বৃদ্ধি এবং জিডিপিতে রাজস্বের অংশ বিবেচনার ভিত্তিতে) ২০০৮ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের উপযোগী বয়সের শিশুদের শতকরা ৫০ ভাগের অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষায় সরকারি বরাদ্দ জিডিপির শতকরা ৪ ভাগে উন্নীত হওয়া প্রয়োজন। (World Bank, Education Sector Review, Vol. 1, 2000, pp. 58-108.) একইভাবে শিক্ষার সকল স্তরের আবশ্যকীয় মানোন্নয়নে সরকারি সামগ্রিক বাজেটের অনুপাত-হিসেবেও বরাদ্দ আরও বাড়তে হবে। শিক্ষাখাতে সরকারি বরাদ্দ ২০০০ সালে শতকরা ১৫ ভাগের তুলনায় অনুমান করা হয়েছে ২০০৮ সালে শতকরা ২৬ ভাগে বাড়ানো দরকার। এর পরিপ্রেক্ষিতে আগামী পাঁচ বছরে শিক্ষাখাতে সরকারি বরাদ্দ জিডিপির ৫ ভাগে বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষাজীবী মহলে দাবি উঠেছে।

৫. ব্যয় বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়

একটি সত্য অনুধাবন করতে হবে যে, কেবল ব্যয়ের বরাদ্দ বাড়ালেই আশানুরূপ ফল নিশ্চিত হবে না। এ জন্যে প্রয়োজন শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা ও শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার দুর্বলতা চিহ্নিত করা ও এগুলো দূর করে মান

উন্নয়ন নিশ্চিত করা। বহু বছর ধরে শিক্ষাখাতে অপ্রতুল বরাদ্দ একটি ব্যাপক সমস্যা, কিন্তু অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ সব সমস্যার সমাধান নয়। সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের জন্য শিখন-উদ্দেশ্য ও শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৬. ক্রমবর্ধমান বরাদ্দ বৃদ্ধি

রাজস্ব বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাধারণ প্রক্রিয়া হচ্ছে বর্তমান বরাদ্দকে ভিত্তি ধরে নতুন বছরের জন্য কিছু যোগ করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাজেটে কী পরিমাণ বরাদ্দ হবে তা নির্ভর করে আগের বছরের বরাদ্দ বাজেট এবং দর কষাকষির সামর্থ্যের ওপর বা রাজনৈতিক দল ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে যোগসূত্রের প্রভাব খাটিয়ে কিছু বরাদ্দ বৃদ্ধি। একটি প্রতিষ্ঠান থেকে যে পরিমাণ বরাদ্দ দাবি করা হয় তার শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত অনুমোদন দেওয়া একটা সাধারণ প্রচলন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকল পর্যায়ে ব্যাপক অদক্ষতা ও অকার্যকারিতার কথা বিবেচনা করে বর্তমানে কী আছে এবং কী বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তার যৌক্তিকতা বিবেচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। কার্যকারিতার মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োগ করা প্রয়োজন যাতে ব্যবস্থাপকরা কাজ করতে উৎসাহ পান এবং অপচয় ও অদক্ষতা প্রতিরোধ করতে পারেন।

৭. মাধ্যমিক শিক্ষায় গুরুত্ব প্রদান

১৯৯০ দশকের প্রারম্ভে প্রাথমিক শিক্ষায় উন্নয়ন এবং রাজস্ব ব্যয়ের প্রাধান্য ছিল। পরবর্তী বছরে মাধ্যমিক শিক্ষায় অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ৯০ থেকে ৯৮ অর্থবছরের মধ্যে রাজস্ব বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষার অংশ ৪৮.৫% থেকে ৪০.৪% এ নেমে আসে এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় তা ৩৬.৮% থেকে ৪৭.৬% এ উন্নীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় উপখাতে উন্নয়ন ব্যয় কমে আসে। বাজেটে বরাদ্দ এবং ব্যয়, বিশেষ করে উন্নয়ন খাতে ব্যয়-কৌশল ও নীতিগত অগ্রাধিকার পর্যালোচনার পরিবর্তে সহযোগিতা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া কোন সমস্যা নয়, বরং এই উপখাতে বহু আগেই বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ছিল। এক খাতের বরাদ্দ অন্য খাতে দিয়ে বাজেটে বৃদ্ধির চাইতে, লক্ষ্য অর্জন এবং প্রতিটি শিক্ষা উপখাতে মান উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ বরাদ্দের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। (Ministry of Finance, cited in World Bank, Education Sector Review, Vol. 1, Table 2.2, p.63, Dhaka, 2000.)

৮. লোকবলের জন্য ব্যয়

সম্প্রতি অর্থবছরগুলোতে শিক্ষার জন্য রাজস্ব বাজেটের শতকরা ৯৭ ভাগ খরচ হয়েছে কর্মচারীদের বেতন পরিশোধে। এর মধ্যে অসুদর্ভুক্ত সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের জন্য আর্থিক সাহায্য। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকারি অনুদানের একটি বড় অংশ শিক্ষকদের বেতনে ব্যয় হয়। এই ব্যয়ের পর মান উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে বরাদ্দ থাকে খুবই সামান্য। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থ বরাদ্দের ৭৪ ভাগ ব্যয় হয়েছে বেতন প্রদানে। এই হার অত্যন্ত বেশি যেখানে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে কার্যকর প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও নিত্যববহার্য উপকরণ থাকা প্রয়োজন। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রাজস্ব বাজেটের শতকরা ৬৭ ভাগ ব্যয় হয়েছিল শিক্ষকদের বেতন পরিশোধে। আনুষ্ঠানিক মানদণ্ডে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং উচ্চশিক্ষা খাতে এই

হার অত্যন্ডবেশি। বাজেটে বরাদ্দের এই প্যাটার্নের ফলে বেতনবাদে অন্যান্য খাতে খুব কম বরাদ্দ থাকে এবং এতে শিক্ষার মান সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। অন্যদিকে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অংশের জন্য পরিচালিত হয়। এখানে রবরাদ্দের শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষকদের বেতন বাবদ ব্যয় হয় এবং বাকি বরাদ্দ শিখন সামগ্রী, তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণে ব্যয় হয় এর ফলে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন উন্নত হয়।

৯. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় উপবৃত্তি খাতে উচ্চ ব্যয়

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের জন্য উন্নয়ন বাজেটের একটি বড় অংশ ব্যয় হয়। উভয়ক্ষেত্রেই কেবল গ্রামাঞ্চলে বৃত্তি দেওয়া হয়। প্রাথমিক স্তরের প্রতি স্কুলের শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হয়। মাধ্যমিক স্তরের কেবল মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয় এবং সাথে সাথে তাদের বেতনও মওকুফ করা হয়। উপবৃত্তি খাতে ২০০২-২০০৭ সাল পর্যন্ড পাঁচ বছরে ৬০০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ আছে। এই বরাদ্দ উন্নয়ন খাতে সরকারের নিজস্ব বাজেটের দুই-তৃতীয়াংশ এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রমের বাজেটের অর্ধেক। একইভাবে প্রাথমিক স্তরের এবং মাধ্যমিক স্তরের মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি ও অবৈতনিক শিক্ষা বাবদ মোট উন্নয়ন ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ বরাদ্দ হয়। (World Bank, Education Sector Review, Vol.1, pp. 64 and 86) উন্নয়ন ব্যয়ের একটি বড় অংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের উপবৃত্তি খাতে খরচ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব ঘটিয়েছে। একটি প্রধান প্রশ্ন উপবৃত্তি খাতে বিশাল ব্যয় শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপের জন্য বরাদ্দ কমিয়ে দেয় কি না। উপবৃত্তি খাতে ব্যয়ের কার্যকারিতা সম্পর্কে (এডিবি এবং বিশ্বব্যাংক সমর্থিত সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা) তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়- (ক) উপবৃত্তি কার্যক্রম টেকসই কি না, কারণ উপবৃত্তির জন্য রাজনৈতিক চাপ কাজ করে, (খ) উপবৃত্তি কার্যক্রম দুর্নীতিমুক্ত হয়ে কার্যকরভাবে পরিচালিত হতে পারছে কি না (গ) উপবৃত্তি কার্যক্রমে শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, শিক্ষায় সমতা ও মানোন্নয়নে অবদান রাখছে কি না; যা সরাসরি কার্যকর সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব (Knowles 2001)।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা, অর্থ সাহায্য দিয়ে দরিদ্র জনগণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা তৈরি করাটা কতটুকু জরুরি। বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক দরিদ্র জনগণের জন্য পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, সমস্যাটি হচ্ছে সরবরাহের অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের পরিবারের ওপর শিখন-সামগ্রী কেনা ও অন্যান্য খরচের বোঝা চাপিয়ে না দিয়ে সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

১০. শিক্ষায় সমতা ও অর্থায়ন

উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে বর্তমান অর্থায়ন পদ্ধতি শিক্ষাব্যবস্থায় অসমতাকে আরও জোরদার করে। ১৯৯৬ সালে শিক্ষাখাতে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত একটি সরকারি ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিবারের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষার প্রতি স্তরে, বিশেষত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় (World Bank, Bangladesh: From Counting the Poor to Making the Poor Count, 1998)*। একই প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয় যে, দরিদ্র পরিবার যা মোট পরিবার সংখ্যার শতকরা ৫৪ ভাগ; উচ্চ শিক্ষায় মোট বরাদ্দের শতকরা ১৫ ভাগের অংশীদার হয়। অবশিষ্ট অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন পরিবারগুলোর অংশ হচ্ছে শতকরা ৮৫ ভাগ (Table A4. 3, p.63)। প্রাথমিক শিক্ষার সেবাদান ও কার্যকারিতা জনসংখ্যার আয়ের সাথে সম্পর্কিত। এর মানে হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা

অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিবিধান হিসেবে ব্যর্থ। শিক্ষার্থীদের দেওয়া বেতন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটের শতকরা ১ ভাগেরও কম। জনসাধারণের কর প্রদত্ত অর্থে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলে। অথচ উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেশের বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠী গ্রহণ করতে পারে না। উচ্চ শিক্ষার অর্থায়নও তাই সমাজের বৈষম্য বৃদ্ধিতে সহায়তা রাখছে। সমতা সৃষ্টির জন্য ব্যয়ভারের অংশীদারিত্ব এবং খরচ তুলে আনার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। বিশেষত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি ব্যয়ে ব্যক্তির লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে অত্যন্ডু অসমভাবে। শিক্ষায় অর্থায়ন ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্তসমূহকে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের যথার্থ বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে হলে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো সুস্পষ্ট ও বোধগম্যভাবে বর্ণিত হতে হবে। উপযোগী করে তুলতে হলে পরিমাণ ও মান সম্পর্কিত উদ্দেশ্যগুলোর যথাযথ সমন্বয় ও বোধগম্যতা প্রয়োজন। একই সাথে প্রয়োজন সম্পদের সংস্থান ও ব্যবহারের প্রক্রিয়া ও কৌশল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা। শিক্ষার অর্থায়ন ব্যবস্থা নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্লেষণ ও গবেষণার অভাব শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার একটি অন্ড্রায়। এ জন্যে প্রয়োজন গবেষণার, বিশেষত অর্থনীতির ক্ষুদ্র পর্যায়ে – পরিবার, বিদ্যালয়, এলাকা এবং জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা অর্থায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে থেকে প্রতিটি পর্যায়ে ও শিক্ষার্থী পর্যন্ড শিক্ষাজনিত সূত্র খুঁজতে হবে এবং সকল পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্ড্রয়ীণ ফলপ্রসূতা পর্যালোচনা করতে হবে।

তথ্যসূত্র

1. World Bank, Education Sector Review, Vol. 1, 2000, pp. 58-108.
2. Ministry of Finance, cited in World Bank, Education Sector Review, Vol. 1, Table 2.2, p.63, Dhaka, 2000.
3. World Bank, Education Sector Review, Vol.1, pp. 64 and 86.
4. Knowles 2001.
5. World Bank, Bangladesh: From Counting the Poor to Making the Poor Count, 1998*
6. Table A4. 3, p.63.
7. Education Watch, 2000.

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে পারদর্শিতা*

ড.: ছিদ্দিকুর রহমান**

সার সংক্ষেপ

২০০১ সালের শেষ দিকে দেশের নির্বাচিত ১৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা সম্পর্কিত সব গুরুত্বপূর্ণ দিক পরিবীক্ষণ করা হয়। এখানে কেবল শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনের ফলাফল উপস্থাপন করা হল। পরিবীক্ষণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফলনির্যাস হলো: (ক) ‘নির্ধারিত শিক্ষাক্রম’ এবং ‘বাস্তবায়িত শিক্ষাক্রম’-এর মধ্যে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। ৭৬% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (জিপিএস) এবং ৮৮% রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (আরএনজিপিএস) শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্ব নির্ধারিত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে কোন পরিকল্পনা তৈরি করেন নি, (খ) অধিকাংশ শিক্ষকই সনাতনী নির্দেশমূলক কায়দায় ক্লাসে শিক্ষাদান করেন, ৪৪% শিক্ষক কেবল বক্তৃতা পদ্ধতি অনুসরণ করেন, (গ) প্রায় ৪০% জিপিএস এবং ৭৫% আরএনজিপিএস শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা কোন ধারণা তৈরি কিংবা বিচার-বিশে-ষণ করতে পারল কিনা সেদিকে নজর না দিয়ে মুখস্থের ওপর জোর দেন। তাছাড়া সাধারণভাবে শিক্ষকদের শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ এবং চিত্র ব্যবহারে অনীহা প্রকাশ পায়, (ঘ) কিছু শিক্ষক বিভিন্ন শব্দ ভুল উচ্চারণ করেন এবং/অথবা ভুল বানান লিখেন, কিছু শিক্ষক পাঠ্যবস্তু সম্পর্কে ভুল তথ্য এবং/অথবা ভুল ধারণা দেন, অনেকে সমস্‌ড ক্লাসকে উদ্দেশ্য না করে নির্দিষ্ট কয়েকজন শিক্ষার্থীকে এলোমেলো এবং ধোঁয়াটে প্রশ্ন করেন, (ঙ) বাংলা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ এবং বিজ্ঞানে অর্জন নির্ণায়ক পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং সম্মিলিত স্কোরের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফলে ব্যক্তি শিক্ষার্থীর পার্থক্যের পরিবর্তে বিদ্যালয়ের পার্থক্য গুঠে আসে। মোট ১৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাফল্যাস্কের গড় ৩৩% এবং আদর্শ বিচ্যুতি ১০%।

সূচনা

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অধীনে উপদেষ্টাদের নিয়ে গঠিত একটি দল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পারদর্শিতা পরিবীক্ষণের জন্য একটি মডেল প্রণয়ন করেন। সেই মডেল ব্যবহার করে ২০০১ সালের শেষদিকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে বাছাই করা ১৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পারদর্শিতা পরিবীক্ষণ করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রায় সমস্‌ড গুরুত্বপূর্ণ পারদর্শিতার ক্ষেত্র এই পরিবীক্ষণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সমস্‌ড ক্ষেত্র থেকে কেবল শ্রেণীকক্ষে অনুসৃত শিখন-শেখানো কৌশল এবং চারটি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সাফল্য অর্জনের অংশটুকু এই গবেষণাপত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। শিক্ষকগণের

* প্রবন্ধটি বাংলাদেশ এডুকেশন জার্নাল-এ (খন্ড-১, সংখ্যা-১, ডিসেম্বর ২০০২) প্রকাশিত গবেষণাপত্রের ভাষাস্‌জ্ঞ। ইংরেজিতে লেখা মূল প্রবন্ধটির ভাষাস্‌জ্ঞ করেছেন মো: মোস্‌ড্‌ফিজুর রহমান, এম.ফিল. গবেষক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্‌টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

** ড. ছিদ্দিকুর রহমান- অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্‌টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষাদান-পূর্ব প্রস্তুতি, শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পাঠদান, শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, শিখন-সহায়ক উপকরণের ব্যবহার, যথাযথ শিখন পদ্ধতির ব্যবহার, জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে পাঠ্যবিষয়ের সংশ্লিষ্টতা, মুখস্থ করার ওপর গুরুত্বারোপ, শিক্ষক কর্তৃক প্রতিকারমূলক সহায়তা প্রদানের মাত্রা, দলগত কাজের সুযোগ, বিষয়বস্তুর উপযোগিতা ইত্যাদির চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণাপত্রে।

গবেষণাকার্যের অভীক্ষার জন্য উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়া

(ক) শ্রেণীকক্ষ কার্যাবলি ভিডিও-রেকর্ডিং, (খ) শ্রেণীকক্ষ কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ, (গ) অর্জন অভীক্ষা, (ঘ) বিদ্যালয় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত তথ্যের পর্যালোচনা, এবং (ঙ) প্রধান শিক্ষক, শ্রেণী শিক্ষক, অভিভাবক এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের সাক্ষাৎকার।

শ্রেণীকক্ষে অনুসৃত শিখন-শেখানো কৌশল

শিখন নিশ্চিত করাই শিক্ষা সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত লক্ষ্য। আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারায় প্রাথমিক পর্যায়ে শিখন বলতে নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহ অর্জনকে বোঝায়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে জড়িত সকলেই শিখন উপযোগী পরিবেশ তৈরির সাথে জড়িত। কিন্তু শিক্ষকগণ প্রত্যক্ষভাবে শিখন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যান। শিক্ষকগণ যদি যথাযথ শিখন সহায়তা প্রদান করেন তাহলে শিক্ষার্থীরা দ্রুত এবং সহজে শিখতে পারে। যথাযথ শিখন সহায়তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীর জন্য যথাযথ কৌশল নির্বাচন ও এর ব্যবহার এবং পাঠের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৌশল নির্বাচন। একথা সকলেরই জানা যে, কার্যকর এবং স্থায়ী শিখন অনেকাংশেই নির্ভর করে শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর মানসিক এবং শারীরিক সংযুক্তির ওপর।

শিক্ষকগণের পূর্ব-প্রস্তুতি

যে-কোন প্রচেষ্টার সফলতা নির্ভর করে তার সহায়কদের প্রস্তুতির ওপর। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের/সহায়তাকারীর প্রস্তুতি বলতে বোঝায় অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ নির্দিষ্টকরণ, লক্ষ্য পৌছানোর জন্য অনুসরণীয় কৌশলাদি, কৌশলাদি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ এবং যোগ্যতা অর্জনের মাপকাঠি নির্ধারণ।

২০৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (জিপিএস) এবং ৯৪টি নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (আরএনজিপিএস) শ্রেণী শিক্ষকদের পর্যবেক্ষণ এবং ভিডিও ধারণ করা হয়। শিক্ষকদের শিক্ষাপ্রণালী থেকে এটি পরিষ্কার হয় যে ৩২% জিপিএস শিক্ষক এবং ১৮% আরএনজিপিএস শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করছেন। দুই-তৃতীয়াংশ জিপিএস শিক্ষক এবং ৩৮% আরএনজিপিএস শিক্ষক সংগঠিত এবং তাঁরা যা অর্জন করতে চান সে সম্পর্কে তাঁরা অবহিত। বাকি শিক্ষকগণকে মনে হয়েছে তাঁরা নিশ্চিত নন। অধিকাংশ শিক্ষক (জিপিএস এবং আরএনজিপিএস- এর সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষক) ধারণা প্রদান করেন যে, অতিরিক্ত চাপের কারণে তাঁরা পাঠ-পরিকল্পনা করতে পারেন না। বাস্তবতা হচ্ছে, সঠিক প্রস্তুতি ক্লাসের অতিরিক্ত চাপ লাঘব করে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন

‘নির্ধারিত শিক্ষাক্রম’ এবং ‘ব্যবহারিক শিক্ষাক্রম’-এর মধ্যে রয়েছে বিস্তৃত পার্থক্য। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাক্রমের প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে প্রতীয়মান হয়। অধিকাংশ শিক্ষক (জিপিএস এর ৭৬% এবং আরএনজিপিএস-এর ৮৮%) স্বীকার করেন যে, পাঠ উপস্থাপনায় তাঁরা পূর্ব-নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহ

অনুসরণ করেন না। অধিকাংশ শিক্ষক (জিপিএস এর ৫৫% এবং আরএনজিপিএস এর ৮৮%) নিজেরা যে-বিষয়ে পাঠদান করেন সে বিষয়ের যোগ্যতার তালিকা দেখাতে পারেন নি। জিপিএস শিক্ষকগণের তুলনায় অধিকসংখ্যক আরএনজিপিএস শিক্ষক শিক্ষাক্রমে অসুড়ভুক্ত যোগ্যতাসমূহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। তাঁরা শুধু পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে থাকেন। শিক্ষাক্রম সম্পর্কে তাঁদের কোনরূপ ধারণাই নেই।

শিখন প্রক্রিয়ায় শিশুদের অংশগ্রহণ

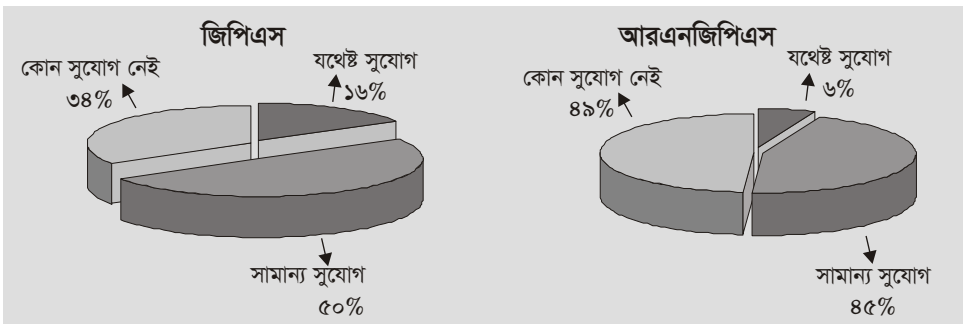
শিখন একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া। শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ শিখনকে সহজ, কার্যকর এবং স্থায়ী করে। সক্রিয় শিখন, অংশগ্রহণমূলক শিখন এবং হাতে-কলমে শিখন আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে প্রবচনের মত। জিপিএস-এর ৩৪% এবং আরএনজিপিএস-এর ৪৯% শিক্ষক শিশুদেরকে শিক্ষাদান-শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের কোনরূপ সুযোগই দেন নি। কেবলমাত্র জিপিএস-এর ১৬% এবং আরএনজিপিএস-এর ৬% শিক্ষক যথাসময়ে এ ধরনের সুযোগ দিয়েছেন। অন্যান্য কিছু শিক্ষক শিশুদেরকে কদাচিৎ এ ধরনের সুযোগ দিয়েছেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে, শিশুদের অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ ছিল প্রশ্নের উত্তর প্রদান, ছবি ব্যখ্যা করা, খাতায় অথবা ব-কবোর্ডে প্রশ্নের উত্তর লেখা এবং পাঠ্যপুস্তকের অংশবিশেষ পাঠ করার মধ্যে। কোন শিক্ষকই শিশুদেরকে হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দেন নি।

অধিকাংশ শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে সনাতনী নির্দেশনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। শিশুরা যাতে একটি সমস্যার সমাধান নিজেরাই খুঁজে বের করতে পারে এমন কোন সৃজনশীল বা উদ্ভাবনমূলক কর্মকাণ্ড যেমন ছোটখাট প্রকল্প অথবা দলগত কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ তাদেরকে দেওয়া হয় নি। প্রায় এক চতুর্থাংশ শিক্ষক কখনও শিশুদের কাছ থেকে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া নেয়ার চেষ্টা করেন নি। অল্প কিছুসংখ্যক (৩%) শিক্ষককে প্রায়ই এমনটি করতে দেখা গিয়েছে।

বক্তৃতাদান পদ্ধতি হলো একটি একমুখী শিখন পদ্ধতি যেখানে শিক্ষক থাকেন যোগানদাতার ভূমিকায় আর শিশুরা নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা মাত্র। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় এটি মোটেই কোন কার্যকর পদ্ধতি নয়। এই প্রক্রিয়ায় কেবল শ্রবণ করা ছাড়া শিক্ষার্থীদের আর কোন ভূমিকাই থাকে না। পর্যবেক্ষণকৃত ৩০০টি ক্লাসের মধ্যে ১৩২টি ক্লাসের (৪৪%) শিক্ষক পাঠদানকালে প্রধানত বক্তৃতা দিয়েছেন। সাধারণত জিপিএস এর তুলনায় অধিকসংখ্যক আরএনজিপিএস বিদ্যালয়ের ক্লাসের শিক্ষকগণকে বক্তৃতাদান পদ্ধতি বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

চিত্র ১: শিখন প্রক্রিয়ায় শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ

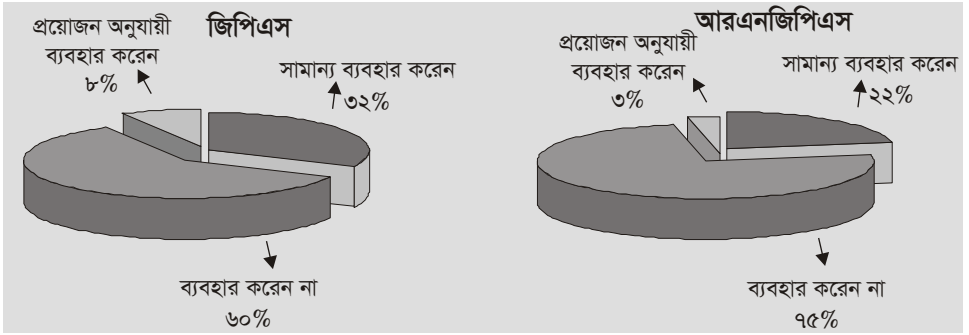


শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ এবং চকবোর্ডের ব্যবহার

সঠিক শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের কার্যকর ব্যবহার শিক্ষার্থীর স্বচ্ছ ধারণা তৈরিতে সাহায্য করে থাকে। এছাড়া, শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের ব্যবহার শিশুদের নিকট পাঠ্যবস্তুকে আকর্ষণীয় করে তুলে। সাধারণভাবে সকল শিক্ষককেই এই ধরনের উপকরণ অথবা চিত্র ব্যবহারে অনিচ্ছুক মনে হয়েছে।

অধিকাংশ শিক্ষক (জিপিএস-এর ৬০% এবং আরএনজিপিএস-এর ৭৪%) ক্লাসে কোনরূপ শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ কিংবা চিত্র ব্যবহার করেন নি। কেবল জিপিএস-এর ৪% এবং আরএনজিপিএস-এর ৩% শিক্ষক স্বল্পমাত্রায় শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করেছেন। অন্য অল্প কয়েকজন শিক্ষক একবারমাত্র পাঠে এগুলো ব্যবহার করেছেন।

চিত্র ২: শিক্ষকগণ কর্তৃক শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ব্যবহার



শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে চকবোর্ড হতে পারে একটি কার্যকর শিক্ষাদান উপকরণ। আরএনজিপিএস-এর মোট ২০ জন (২১%) শিক্ষক এবং জিপিএস-এর ১৮ জন (৯%) শিক্ষক পাঠদানকালে প্রয়োজনীয় মুহূর্তেও একটি বারের জন্য চকবোর্ড ব্যবহার করেন নি। অন্যদিকে, জিপিএস-এর ২২% এবং আরএনজিপিএস-এর ৭% শিক্ষক ক্লাসে প্রয়োজনমতো চকবোর্ড ব্যবহার করেছেন। অল্প কয়েকজন শিক্ষক একবার কি/দু'বার চকবোর্ড ব্যবহার করেছেন। জিপিএস এর তুলনায় আরএনজিপিএস-এর শিক্ষকদেরকে এক্ষেত্রে অধিকহারে নিরুৎসাহী মনে হয়েছে। চকবোর্ডে ৮০% জিপিএস এবং আরএনজিপিএস-এর ৫০% সংখ্যক শিক্ষকের হাতের লেখা পাঠযোগ্য- কিছুটা বড়সড়, স্পষ্ট এবং পিছনের বেঞ্চ থেকে দৃশ্যমান। চকবোর্ডে ৫% জিপিএস এবং ২০% আরএনজিপিএস শিক্ষকের লেখা অস্পষ্ট-পাঠোদ্ধার খুবই কঠিন বলে মনে হয়েছে।

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির ব্যবহার

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতির তুলনায় প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে কতগুলো সুবিধা রয়েছে, বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে। প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি একটি দ্বিমুখী যোগাযোগ পদ্ধতি, অন্যদিকে বক্তৃতা একটি একমুখী পদ্ধতি। তবে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে এর সঠিক ব্যবহারের ওপর।

অধিকাংশ শিক্ষক (৯৩%) শিশুদেরকে প্রশ্ন করে উত্তর দিতে বলেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র ১৬% জিপিএস এবং ১০% আরএনজিপিএস শিক্ষক তা নিয়মিত করেছেন। অন্যরা করেছেন অনিয়মিতভাবে। কিছুসংখ্যক

শিক্ষক বাদে অন্য সবাই সনাতনী পদ্ধতিতে সরাসরি বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন করেছেন। কেবল ২০% জিপিএস এবং ১৭% আরএনজিপিএস শিক্ষক শিশুদেরকে এমন কিছু প্রশ্ন করেছেন যার উত্তর দিতে শিশুদেরকে নিজস্ব চিন্তাশক্তি ব্যবহার করতে হয়।

যে-সমস্যাশিক্ষক প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তাদের অধিকাংশই (৮১%) সঠিক কোন কৌশল অবলম্বন করেন নি। ক্লাসের সবাইকে সামগ্রিকভাবে একটি প্রশ্ন করে তারপর ক্লাসের যে-কোন একজনকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে বলার পরিবর্তে শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি শিশুকে প্রশ্ন করেছেন; ফলে, ক্লাসের বাকি সবাইকে অলস এবং নিষ্ক্রিয় থাকতে হয়েছে।

কিছুসংখ্যক শিক্ষক (১০% জিপিএস এবং ১০% আরএনজিপিএস) বাদে সকল শিক্ষক ক্লাসে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীকে একই সাথে প্রশ্ন করেছেন। এ পদ্ধতির ফলে শিক্ষকগণের পক্ষে কোন শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম নয় তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষক (৫% জিপিএস এবং ৭% আরএনজিপিএস) সঠিক উত্তরটি কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে দিয়ে বারবার বলানোর পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। অন্যরা এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন নি। এই পদ্ধতিতে দুর্বল শিক্ষার্থীরাও শিখতে পারে।

অধিকাংশ শিক্ষকের প্রশ্ন ছিল পুঙ্খভিত্তিক, স্মৃতিনির্ভর এবং সনাতনী। কিন্তু সকল প্রশ্নই ছিল স্বচ্ছ এবং সুনির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত। কিছুসংখ্যক শিক্ষকের প্রশ্ন ছিল ঘোঁয়াটে ও অস্বচ্ছ।

বক্স-১: কিছু শিক্ষকের করা কয়েকটি অস্বচ্ছ প্রশ্নের নমুনা

বাংলাদেশ সম্পর্কে তোমরা কী জান?
কাক কী ধরনের পাখি?
নারী কি?
নেপালের লোকজন কেমন?
ঘড়ি আমাদেরকে কিভাবে সময় দেয়?

জীবন-অভিজ্ঞতা সম্পৃক্ত পাঠ

শিখন একটি ধাপে ধাপে অগ্রসরমান প্রক্রিয়া, যেখানে প্রত্যেক অভিজ্ঞতা পরবর্তী অভিজ্ঞতার ভিত্তি নির্মাণ করে। পূর্বের কোন অভিজ্ঞতার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারলে পরবর্তী অভিজ্ঞতার অর্জন সহজতর হয়। শিক্ষার্থীদের জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ টেনে কিংবা শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে পাঠ্যবস্তুকে মিলিয়ে দেখালে শিখন সহজ এবং দৃঢ় হয়।

কেবল ৬ জন জিপিএস শিক্ষক যথাযথ সময়ে শিক্ষার্থীদের জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ টেনেছেন; ৫৪% জিপিএস এবং ৬৪% আরএনজিপিএস শিক্ষক একবারও তা করেন নি। অধিকাংশ শিক্ষক (৬১% জিপিএস এবং ৬৯% আরএনজিপিএস) জীবনের বাস্তব পরিস্থিতির সাথে পাঠ্যবস্তুকে সম্পৃক্ত করে দেখান নি। কিছুসংখ্যক শিক্ষক এমনটি করেছেন একবার কি দুবার, যদিও আরো বেশি করার সুযোগ ছিল। এমনকি পানির ব্যবহার কিংবা পরিবার প্রধানের পেশাবিষয়ক পাঠদানের বেলায়ও শিক্ষকগণ শুধু পাঠ্যপুঙ্খ থেকে পাঠ করেছেন, কিন্তু এমন কোন প্রশ্ন করেন নি যার সাথে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে দেখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পানি দিয়ে তোমরা কী কর? কিংবা ধানক্ষেত শুকিয়ে গেলে তোমরা কী কর? – এমন কিছু প্রশ্ন করলে শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনের সাথে পাঠ্যবিষয়কে মেলাবার সুযোগ পেত।

মুখস্থের ওপর গুরুত্বারোপ

একটি ভিত্তি হিসেবে বিভিন্ন স্বতঃসিদ্ধ বিষয় বা ঘটনা মুখস্থ করা প্রয়োজন, কিন্তু যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা

হলো শিশুরা সেই মুখস্থ বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে ধারণা গঠন ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে অগ্রসর হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন প্রকার ধারণা ব্যতীত জনসংখ্যার ঘনত্বের সংজ্ঞা কিংবা পানি দূষণ সম্পর্কে মুখস্থ করা শিখন নয়। যেখানে ধারণা তৈরি জরুরি ছিল সেখানেও প্রায় ৪০% জিপিএস এবং ৭৫% আরএনজিপিএস শিক্ষক মুখস্থ করার ওপর জোর দিয়েছেন।

শিশুদের সমস্যা নির্ণয়

কিছুসংখ্যক শিক্ষক (২৪% জিপিএস এবং ৮% আরএনজিপিএস) শিশুদের সমস্যার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন এবং শিশুরা একটি বিষয় না বুঝলে তা যত্নের সাথে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু অনেক শিক্ষকই তা করেন নি।

নিরাময়মূলক সহায়তা

শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিখন-সমস্যায়ুক্ত শিশুদের শনাক্তকরণ এবং সেই সমস্যা সমস্যা উত্তরণের জন্য নিরাময়মূলক সহায়তা দান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন শিক্ষককেই শিখন-সমস্যায়ুক্ত শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ বা কোচিং-এর আয়োজন করতে দেখা যায় নি। সহপাঠীদের দিয়েও তাদের জন্য বিশেষ কোচিং-এর ব্যবস্থা করা যেত। এটি করলে শুধু দুর্বল শিক্ষার্থীরাই উপকৃত হতো না, যে সমস্যা সহপাঠীরা কোচিং করাচ্ছে তাদেরও একটি চমৎকার শিখন অভিজ্ঞতা হতো।

শিশুদের মতামতের স্বীকৃতিদান

শিশুদেরকে নিজস্ব মতামত প্রকাশ এবং আলোচনায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানালে তাদের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটে। এই ধরনের উদ্যোগ শিশুদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতেও সহায়তা করে। যাহোক, জরিপ থেকে জানা যায় যে, কেবল ২% জিপিএস শিক্ষক আলোচনাকালে শিশুদেরকে মত প্রকাশ করার সুযোগ দিয়েছেন। কিছুসংখ্যক শিক্ষক একবার এমনটি করেছেন।

একক এবং দলীয় কর্মকাণ্ড

একক এবং দলীয় কাজ শিশুদেরকে প্রশ্নের উত্তর দান, সমস্যা সমাধান এবং মুক্তভাবে লিখার ক্ষমতা অর্জনের মধ্য দিয়ে তাদের মানসিক সক্ষমতা চর্চার সুযোগ করে দেয়। এই কাজগুলো শিখনকে মজবুত করে তোলে। আরএনজিপিএস শিক্ষকদের এক চতুর্থাংশের বেশি এবং জিপিএস শিক্ষকদের এক সপ্তমাংশের বেশি একক কিংবা দলীয় কোন কাজই শিশুদেরকে দেন নি। কেবল ১৯% জিপিএস এবং ৭% আরএনজিপিএস শিক্ষক গতানুগতিকভাবে শিশুদেরকে একক কাজ দিয়েছেন। যে-সমস্যা শিক্ষক শিশুদেরকে একক কাজ দিয়েছেন তাদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শিশুদের কাজ তদারক এবং তাদের কাজে সাহায্য করেছেন। বাদবাকি শিক্ষক অলসভাবে বসে থাকেন।

অত্যন্ত অল্পসংখ্যক শিক্ষক (৩% জিপিএস এবং ২% আরএনজিপিএস) তাঁদের ক্লাসে দলভিত্তিক কাজ দেন এবং শিশুদেরকে রদবদল করে বসান। অন্য শিক্ষককেরা শিশুদেরকে সারাদিন একই আসনে বসিয়ে রাখেন, শিশুদেরকে কোন দলভিত্তিক কাজ দেন নি এবং যখন কোন কাজ দেন তা ছিল সনাতন পদ্ধতিতে পুঙ্খভিত্তিক। এছাড়া শিশুদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কোন সুযোগ ছিল না। জুটিতে শিখন অর্থাৎ মেধাবী শিশু দিয়ে দুর্বল শিশুকে শেখানো কোন ক্লাসে চোখে পড়ে নি। শিশু থেকে শিশু একটি অন্যতম সফল শিখন কৌশল। এ কৌশলের প্রয়োগ কোন ক্লাসেই খুব একটা চোখে পড়ে নি।

শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখা

সারা পাঠ জুড়ে শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখা এবং তাদেরকে শিখন কর্মকাণ্ডে জড়িত রাখার জন্য দরকার বিশেষ দক্ষতা। উচ্চতর শ্রেণী অপেক্ষা প্রাথমিক স্তরের বিষয়টি আরো কঠিন, তা সত্ত্বেও কার্যকর শিখনের জন্য এটি খুবই জরুরি। জিপিএস শিক্ষকদের অর্ধাংশের কিছুটা বেশি এবং আরএনজিপিএস শিক্ষকদের এক তৃতীয়াংশ সারা পাঠ জুড়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার কাজে সফল ছিলেন। উলে-খযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক (১৪% জিপিএস এবং ৩৩% আরএনজিপিএস) এটি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অনেক শিক্ষককে পঠন-পাঠন থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয়েছে। অন্যরা মাঝে মাঝে শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ

কার্যকর শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি আন্দ্রিক, মনোজ্ঞ এবং আনন্দঘন পরিবেশ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কেবল ৩৬% জিপিএস এবং ৩০% আরএনজিপিএস ক্লাসে এমন একটি পরিবেশ বিরাজমান ছিল। অধিকাংশ ক্লাসে শিক্ষাদান পরিচালিত হয়েছে একটি নিরানন্দ পরিবেশে।

মূল্যায়ন

চলমান মূল্যায়ন শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাঠ পরিচালনার সময় চলমান মূল্যায়ন করা হয় এবং এর মাধ্যমে শিক্ষক বুঝতে পারেন কোন শিক্ষার্থী পাঠ বুঝে আর কে তা বুঝে না। অধিকাংশ শিক্ষক (৮১%) ক্লাসে মৌখিক প্রশ্ন করেছেন; তিন চতুর্থাংশ শিক্ষক ক্লাসে লিখিত প্রশ্ন দিয়েছেন। অর্ধেকসংখ্যক শিক্ষক প্রশ্ন দিয়ে ক্লাসে ঘুরে ঘুরে কে কি করেছে তা তদারক করেছেন। ২৩% জিপিএস এবং ৩০% আরএনজিপিএস শিক্ষকের ক্ষেত্রে প্রশ্নের দৈর্ঘ্য সঠিক ছিল না, বা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নি অথবা তা সমাপ্ত করা শিশুদের ক্ষমতার আয়ত্তে ছিল না। ২৬% জিপিএস এবং ৪৫% আরএনজিপিএস ক্লাসের শিক্ষার্থীগণকে দেখে মনে হয়েছে তারা পাঠ্যবস্তুর কিছুই বুঝে নি অথবা পাঠ্যবস্তু থেকে যতটুকু যোগ্যতা অর্জিত হওয়ার কথা ছিল ততটুকু অর্জন করতে পারে নি।

বাড়ির কাজ

ব্যাপকসংখ্যক শিক্ষক (৮১% জিপিএস এবং ৮৩% আরএনজিপিএস) শিশুদেরকে বাড়ির কাজ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ২১% জিপিএস এবং ৩৯% আরএনজিপিএস শিক্ষক শিশুদের সাথে তাদের আগের দিনের বাড়ির কাজের ভুলত্রুটি নিয়ে কথা বলেছেন। না পড়ে এবং ভুলত্রুটি না দেখে বাড়ির কাজের খাতায় সই দেয়া শিশুদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, কারণ এতে করে শিশুরা মনে করে তারা যা করেছে শিক্ষকের মতে তা সঠিক। জরিপে দেখা যায় যে, কিছু শিক্ষক (১৫জন জিপিএস এবং ১২জন আরএনজিপিএস) ভুলত্রুটি শুধরে না দিয়েই বাড়ির কাজের খাতায় সই করেছেন। কেবলমাত্র ৩৯% জিপিএস এবং ৩৫% আরএনজিপিএস শিক্ষক সংশোধন করে দিয়েছেন শিশুদের এমন বাড়ির কাজের খাতা দেখাতে পেরেছেন।

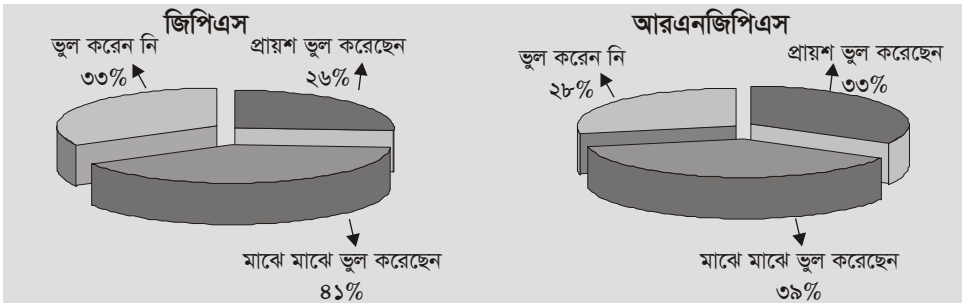
জিপিএস এবং আরএনজিপিএস উভয় ধরনের স্কুলের শিক্ষকদের অর্ধাংশ বলেছেন অধিকাংশ শিক্ষার্থী বাড়ির কাজ সঠিকভাবে ও সন্তোষজনক অবস্থায় সমাপ্ত করতে পেরেছে। অন্যরা ভিন্নমত পোষণ করেছেন। শিক্ষার্থীরা বাড়ির কাজ সম্পন্ন করে নি কেন – এ প্রশ্ন শিক্ষকদেরকে করা হলে তারা যে-সমস্যা

কারণ দেখান তা হলো: বাড়ির কারোর কাছ থেকে সহায়তা না পাওয়া, শিক্ষার প্রতি ছাত্রদের অনীহা এবং গৃহস্থালী এবং উপার্জনমূলক কাজের সাথে জড়িত থাকায় বাড়িতে পড়ার সময় না পাওয়া। অধিকাংশ (৯৪%) অভিভাবক মনে করেন শিক্ষকগণ তাদের সন্তানদের যে বাড়ির কাজ দেন তার পরিমাণ এত বেশি নয় যে তা সম্পন্ন করা যাবে না।

বিষয়বস্তুর যথার্থতা

ভুল উচ্চারণ অধিকাংশ শিক্ষকের ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ প্রবণতা হিসাবে দেখা গেছে। ৬৭% জিপিএস এবং ৭২% আরএনজিপিএস শিক্ষক ক্লাসে ভুল উচ্চারণ করে পাঠ দেন। এর মধ্যে ২৬% জিপিএস এবং ৩৩% আরএনজিপিএস শিক্ষক প্রায়শই তা করে থাকেন। অন্যরা তা করেছেন মাঝে মাঝে। মোট ৬৭ জন জিপিএস এবং ২৬ জন আরএনজিপিএস শিক্ষক ভুল উচ্চারণ কিংবা উচ্চারণে আঞ্চলিকতার প্রয়োগ কোনটাই করেন নি।

চিত্র ৩: স্কুলভিত্তিক শিক্ষকদের ভুল উচ্চারণের ব্যাপ্তি



মোট ৪৮ জন (২৩%) জিপিএস শিক্ষক ক্লাসে পাঠদানকালে ভুল বানানে শব্দ লিখেছেন। ৯৪% এর ২৯ জন অর্থাৎ ৩১% আরএনজিপিএস শিক্ষক এমনটি করেছেন। এদের মধ্যে ১৯ জন প্রায়শই তা করেছেন।

অল্প কিছুসংখ্যক (৭% জিপিএস এবং ৬% আরএনজিপিএস) শিক্ষক পাঠদানকালে ভুল তথ্য দিয়েছেন বা ভুল বিষয়বস্তু পড়িয়েছেন। কিছুসংখ্যক শিক্ষক (৮% জিপিএস এবং ১২% আরএনজিপিএস) পাঠ্যবস্তুর ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষক (২৫% জিপিএস এবং ২২% আরএনজিপিএস) পাঠদানকালে অপ্রাসঙ্গিক উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। প্রায় ১১% জিপিএস এবং ১৫% আরএনজিপিএস শিক্ষক সমস্যার ভুল সমাধান দিয়েছেন। কিছুসংখ্যক শিক্ষক (১৪% জিপিএস এবং ১১% আরএনজিপিএস) অপ্রাসঙ্গিক অথবা ভুল শিক্ষা উপকরণ এবং চিত্র ব্যবহার করেছেন।

বক্স ২: শ্রেণীকক্ষে ভুল বানানের নমুনা

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
বিজ্ঞাণ	বিজ্ঞান	সুশম	সুষম
ঝাউয়ের	ঝাউয়ের	প্রোয়োগ	প্রয়োগ
দন্য	শূন্য	যুদ্ধ	যুদ্ধ
স্বাধন	স্বাধীন	বালিশি	বালিশ
ক্ষুদার্ত	ক্ষুধার্ত	সুদকশা	সুদকষা
ডাবি	টিবি	সাধারণ	সাধারণ
নিণয়	নির্ণয়	বাতাশ	বাতাস
সংস্কারণ	সংস্করণ	সবছেয়ে	সবচেয়ে
শেণী	শ্রেণী	বরন্যে	বরণ্যে
সহিষতা	সহিষ্ণুতা	কলকৌশল	কলাকৌশল
কাশী	শশী	জীবণ	জীবন
বিরন্ধে	বিরুদ্ধে	পয়চলি-শ	পঁয়তালি-শ

বক্স ৩ : শ্রেণীতে ভুল তথ্য ও ভুল ধারণা উপস্থানের নমুনা

ভুল তথ্য / ভুল ধারণা	যথাযথ তথ্য / ধারণা
সৌরজগত হচ্ছে একটি গ্রহ	সূর্য এবং এর গ্রহ ও উপগ্রহ দিয়ে যে পরিবার তাকে সৌরজগত বলা হয়।
দিবাকর অর্থ দিনের বেলা	দিবাকর অর্থ সূর্য।
ক্রয়মূল্য - বিক্রয়মূল্য = লাভ	ক্রয়মূল্য - বিক্রয়মূল্য = ক্ষতি।
২১৩৫১ ৪ - {২ - - + (- + ৪ - ১৫)} ৩২৫৯৬	২১৩৫১ ৪ - {২ - - + (- + ৪ - ১৫)} ৩২৫৯৬
১৪৫৩৫২৫১ = - { - - + (- + - -) ১৫ } ৩২৫৯৬১৫	১৪৫৩৫২৫১ = - { - - + (- + - -) } ৩২৫৯৬১৫
১৫০.০০ -২৯.৭৫ ----- ৩০.২৫	১৫০.০০ -২৯.৭৫ ----- ১২০.২৫
কৃত্রিম উপগ্রহ ২২ হাজার মাইল উপরে স্থির থাকে।	পৃথিবী থেকে সাড়ে ২২ হাজার মাইল উঁচুতে কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ ২৪ ঘন্টায় একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।

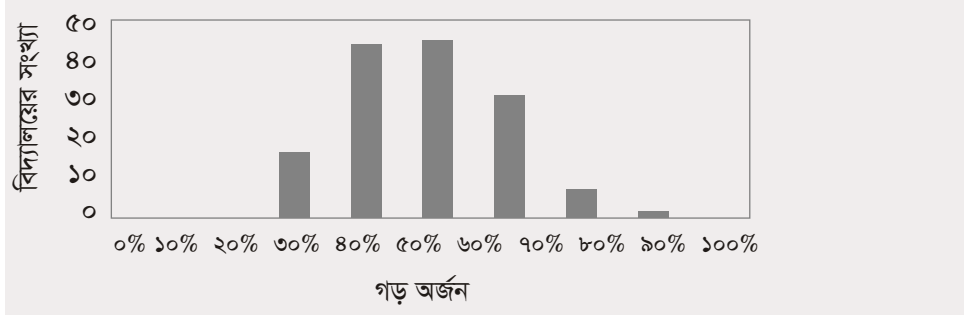
ভুল তথ্য / ভুল ধারণা	যথাযথ তথ্য / ধারণা
৩৬৫ দিনে সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসকে আহ্নিক গতি বলে।	সূর্যের চারদিকে আপন কক্ষ পথে ৩৬৫ দিনে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসাকে বার্ষিক গতি বলে।
সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলি ঘুরছে এই আবর্তনকে তিনি ২৪ ঘন্টায় নিজ অক্ষে একবার আবর্তন বলে ব্যাখ্যা করেছেন।	গ্রহগুলি প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন সময় নিয়ে নিজ অক্ষের ওপর আবর্তনের পাশাপাশি সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে।
শিক্ষক ভগ্নাংশ $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{8}$ কে যথাক্রমে পড়েছেন এক এর দুই এবং এক এর চার।	$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{8}$ কে যথাক্রমে পড়তে হবে দুই এর এক এবং চার এর এক।
চট্টগ্রাম - টু=ট+র	চট্টগ্রাম -টু=ট+ট
ঠান্ডা-ড=ণ+ড	ঠান্ডা-ণ=ণ+ড
মৃত-ম্ব=ম+র	মৃত-ম্ব=ম+ঝ
ও=ত+থ	ও=ত+ত

বিদ্যালয়সমূহের সার্বিক অর্জন

প্রতিটি স্কুলের সার্বিক অর্জন নির্ণয়ের নিমিত্তে চারটি বিষয়ের টেস্ট স্কোর একত্রিত করে একটিমাত্র অর্জন স্কোর তৈরি করা হয়। প্রতিটি স্কুলের অর্জনের পরিমাপ করা হয়েছে উক্ত স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের গড় অর্জন থেকে।

চিত্র: ৪ সার্বিক অর্জনের বিন্যাস

১৫০টি বিদ্যালয়



৪ নং চিত্রে জাতীয় নমুনায় বিদ্যালয়সমূহের সার্বিক অর্জনের বিন্যাস দেখানো হয়েছে। মোট ১৫০টি স্কুলের গড় অর্জন ৩৩% এবং আদর্শ বিচ্ছৃতি ১০%।

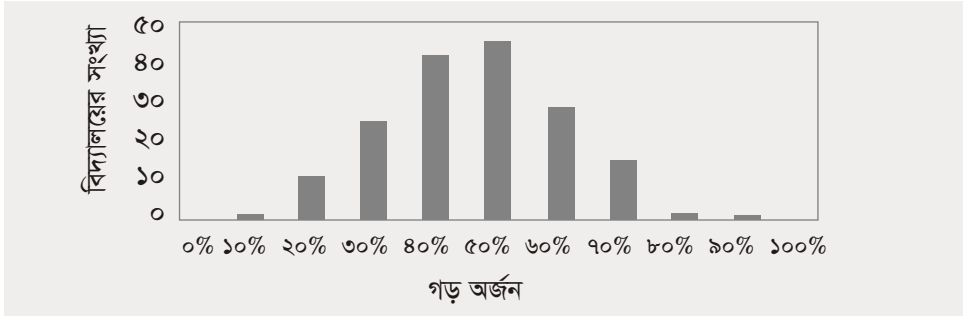
এই ফলাফল বিশ্লেষণে- যণের ক্ষেত্রে পাঠকদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। প্রথমত, এই ফলাফলে ব্যবহৃত তথ্য দেশের স্কুলসমূহের একটি নমুনা থেকে প্রাপ্ত, এ কারণে ফলাফলে নমুনাগত ত্রুটি থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, ছাত্ররা এ ধরনের টেস্টে অংশগ্রহণে অভ্যস্ত নয়। তাই তারা হয়ত তাদের সেরা কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্যের তুলনায় স্কুলগুলোর মধ্যে বিরাজমান আপেক্ষিক পার্থক্য নির্ণয়ে এই টেস্টগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

বিষয়ভিত্তিক অর্জন

৫, ৬, ৭ এবং ৮ নং চিত্রে চারটি বিষয়ের প্রতিটিতে স্কুলসমূহের অর্জন তুলে ধরা হয়েছে। কিছু স্কুল খুব ভাল করলেও, একেকটি বিষয়ে অধিকাংশ স্কুলের গড় অর্জন নিম্ন পর্যায়ে। বাংলায় (চিত্র:৫) গড় অর্জন ছিল ৪১% (আদর্শ বিচ্ছৃতি ১৫%)

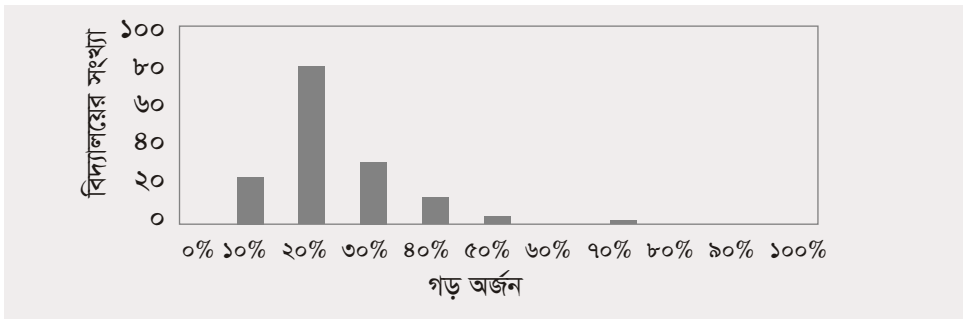
চিত্র ৫: বিদ্যালয়গুলোর বাংলায় অর্জন

১৫০টি বিদ্যালয়



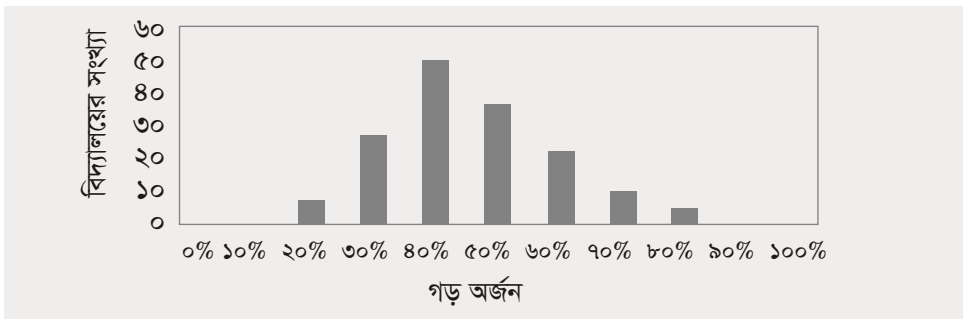
চিত্র ৬: বিদ্যালয়গুলোর গণিতে অর্জন

১৫০টি বিদ্যালয়

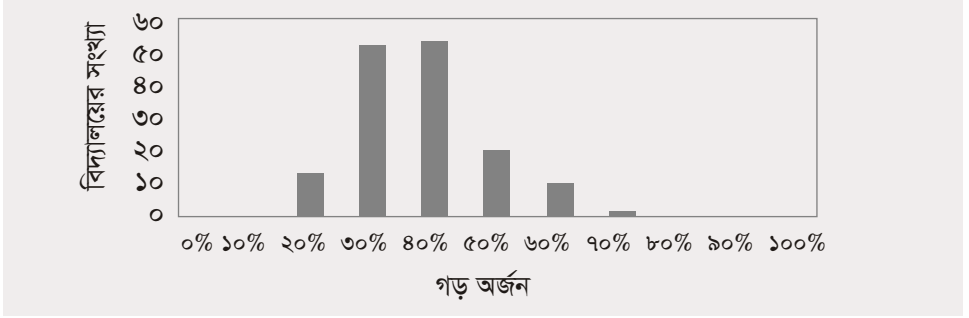


চিত্র ৭: বিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ পরিচিতিতে অর্জন

১৫০টি বিদ্যালয়



চিত্র ৮: বিদ্যালয়গুলোর বিজ্ঞানে অর্জন
১৫০টি বিদ্যালয়



গণিতে (চিত্র: ৬) গড় অর্জন ছিল ১৮% (আদর্শ বিচ্যুতি ৯%)। খুব কম সংখ্যক স্কুলের গড় অর্জন ৫০% এর বেশি। সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গড় অর্জন ছিল ৪০% (আদর্শ বিচ্যুতি ১৩%); অধিকাংশ স্কুলের স্কোর খারাপ। যাহোক, প্রায় এক চতুর্থাংশ স্কুলের গড় ৫০% কিংবা তার ওপর। বিজ্ঞানে (চিত্র: ৮) গড় অর্জন ছিল ৩৩% (আদর্শ বিচ্যুতি ১০%); তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক স্কুলের স্কোর ৫০% -এর বেশি ছিল।

বিজ্ঞান এবং গণিতের তুলনায় সামাজিক বিজ্ঞান এবং বাংলায় গড় শতকরা স্কোর বেশি ছিল। এর কারণ স্পষ্ট নয়; কিন্তু ধারণা করা যায় যে, (ক) বিজ্ঞান এবং গণিতের তুলনায় সামাজিক বিজ্ঞান এবং বাংলায় শিক্ষাদান এবং টেস্ট উভয়ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের সাথে বেশি মিল ছিল। (খ) বাংলা হচ্ছে মাতৃভাষা। বাংলার ক্ষেত্রে টেস্ট-এর সকল আইটেম পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত কিন্তু ভাষা দক্ষতাভিত্তিক। অধিকন্তু, সামাজিক বিজ্ঞান এবং বাংলায় টেস্ট-এর আইটেম ছিল শিক্ষার্থীদের তথ্যভিত্তিক জ্ঞান যাচাইমূলক পরীক্ষা, অবশ্য কিছু প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের সমস্যা-সমাধানের দক্ষতা পরিমাপের জন্য করা হয়েছিল। বাংলা এবং গণিতের ক্ষেত্রে টেস্ট-এর আইটেমসমূহ পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত তথ্য এবং উদাহরণের সাথে ততটা সম্পর্কিত ছিল না। এই টেস্টগুলো শিশুদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিল তারা বিষয়বস্তুভিত্তিক ধারণা আয়ত্ত করতে পারে কি না এবং তারা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে মিল রয়েছে এমন কিছু সরল সমস্যার সমাধান করতে পারে কি না। তাছাড়া, টেস্ট আইটেমের প্রকৃতি শিশুদের স্কোরকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। বাংলা এবং গণিতে মোট নম্বরের ৫০% নির্ধারিত ছিল সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নের জন্য আর বাকি ৫০% নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য। সামাজিক বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানে মোট নম্বরের ৬০% নির্ধারিত ছিল নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য আর বাকি ৪০% রচনামূলক সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্নের জন্য।

শিক্ষাদান এবং শিখন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সাফল্য অর্জনকারী বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে তুলনা

কম এবং বেশি সাফল্য অর্জনকারী বিদ্যালয়গুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে এভাবে : বিদ্যালয়ের সাফল্যাক্ষের গড়সমূহ সাজানো হয়েছিল অবরোহী ক্রমানুসারে। যে-সমস্ত বিদ্যালয়ের গড় স্কোর তালিকার ওপরের এক তৃতীয়াংশে ছিল সেই বিদ্যালয়গুলোকে উচ্চ সাফল্য অর্জনকারী বিদ্যালয় হিসেবে ধরা হয়েছে। আর যে-সমস্ত বিদ্যালয়ের গড় স্কোর তালিকার নিচের এক তৃতীয়াংশে ছিল সেই বিদ্যালয়গুলোকে নিম্ন সাফল্য অর্জনকারী বিদ্যালয় হিসেবে ধরা হয়েছে।

টেবিল ১ : দেশে শিক্ষাদান-শিখন প্রক্রিয়ায় উপাদানসমূহের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সাফল্য অর্জনকারী বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে তুলনা।

উপাদানসমূহের নমুনা	সর্বনিম্ন বিদ্যালয়সমূহের গড়, সংখ্যা = ৪৯	সর্বোচ্চ বিদ্যালয়সমূহের গড়, সংখ্যা = ৫১
যে-সমস্ফুট শিক্ষক শ্রেণীকক্ষকে আগেই ঠিকঠাক করে রেখেছেন তাদের শতকরা হার	৫০	৬৪
যে সমস্ফুট শিক্ষক দ্রুত শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তাদের শতকরা হার	৩০	৫২
শিক্ষকের প্রারম্ভিক বক্তব্যে পাঠ্যবস্তু কিভাবে পড়ানো হবে এবং এতে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা কী তা শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট ছিল সেরকম পাঠের শতকরা হার	১০	১৯
একটি পাঠ কেন পড়ানো হবে এবং তা কেন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষকের সূচনা বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল এরকম পাঠের শতকরা হার	১০	৩০
শিক্ষকদের ভূমিকার ফলে মনে হচ্ছে শিক্ষক একটি পাঠ পরিকল্পনা ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন এরকম পাঠের শতকরা হার	২০	৪৫
শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন আলোচনায় যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন এরকম শিক্ষকদের শতকরা হার	৪০	৭৪
শিক্ষার্থী না বুঝলে শিক্ষক যত্নের সাথে বুঝিয়ে দিয়েছেন এমন পাঠের শতকরা হার	৩০	৬৫
শিক্ষার্থীদেরকে শিখন-কর্মকালে সারা ক্লাস সময়ে ব্যস্ত রাখতে পেরেছেন এরকম শিক্ষকের শতকরা হার	৩০	৫৯
পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মতামত জানতে চেয়েছেন সেরকম শিক্ষকের শতকরা হার	২০	২৭
একটি প্রশ্ন-পরবর্তী প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্নোত্তরের বাইরে আরো কিছু নিয়ে ভাবানোর চেষ্টা করেছেন এমন শিক্ষকের শতকরা হার	১০	২৫
পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন বিষয় বুঝানোর সুবিধার্থে ছবি এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করেছেন এরকম শিক্ষকের শতকরা হার	২০	৪৩

টেবিল-১ এর মাধ্যমে যে-সমস্ফুট বিদ্যালয় সাফল্যাক্ষের তালিকায় সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে তাদের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

সর্বোচ্চ গড় সাফল্যাক্ষের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকগণ তাঁদের ক্লাসরুম আগেভাগেই ঠিকঠাক করে রাখা, দ্রুত শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা ইত্যাদি কাজে অধিকতর আগ্রহী এবং সক্রিয় ছিলেন। উক্ত

বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ঠিকমতো পাঠ-পরিকল্পনা অনুসরণ করেছেন, তাঁরা ছিলেন অধিকতর গোছানো এবং সর্বোপরি তাঁরা শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাদান-শিখন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করেছেন।

সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থী কিছু না বুঝলে তা যত্নের সাথে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরা শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন আলোচনায় যুক্ত করেছেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করেছেন নিজস্ব মত প্রকাশ করতে। তাঁরা চেষ্টা করেছেন শিক্ষার্থীগণ যাতে সাধারণ উত্তরগুলোর বাইরে কিছু ভাবতে পারে। পাঠদানকালে তাঁরা ছবিসহ বিভিন্ন শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করেছেন। নিম্ন সাফল্য অর্জনকারী বিদ্যালয়গুলোর কয়েকজন শিক্ষক যে এমন কিছু করেন নি তা নয়, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

তথ্যসূত্র

1. PSPMP, Primary Education in Bangladesh: Findings of PSMP: 2000 Dhaka-2000.
2. PSPMP, Technical Manuals: Development of Instruments, Sampling Techniques, Data Analysis, Dhaka 2001
3. PSPMP, User's Manual: Implementing the Primary School Performance Monitoring Model, Dhaka-2001
4. The World Bank, 2000, Education Sector Review, Vol. I, II and III.

মাধ্যমিক স্তরের প্রস্তুতবিত একমুখী শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা

মো: মোজ্জার হোসেন *
মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম **

ভূমিকা

শিক্ষাব্যবস্থা কাঠামোর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী এবং উচ্চতর শিক্ষার পূর্ববর্তী স্তর হল মাধ্যমিক শিক্ষা। শিক্ষাব্যবস্থাকে মানবদেহের সাথে তুলনা করলে প্রাথমিক শিক্ষাকে পদযুগল, মাধ্যমিক শিক্ষাকে মেরুদণ্ড এবং উচ্চ শিক্ষাকে মস্তিষ্ক বলা যেতে পারে। সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ও উচ্চারিত কথাটি হচ্ছে “শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড”। প্রকৃতপক্ষে মেরুদণ্ডটি হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর। অর্থনীতির গবেষকগণ বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার না হলে উন্নয়নের যাত্রাই শুরু হয় না। আর উন্নয়ন টেকসই বা স্থিতিশীল করার জন্য প্রয়োজন মাধ্যমিক শিক্ষার। অর্থাৎ একটি দেশের জাতীয় উন্নয়নের জন্য মধ্যম স্তরের দক্ষ জনশক্তিকে গড়ে তোলার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে মাধ্যমিক শিক্ষা। সুতরাং যে-কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত একাধিক স্তর থাকলেও মাধ্যমিক স্তর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।^১

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে, শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বহু ধারা বিদ্যমান। মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা, ইংলিশ মিডিয়াম, ক্যাডেট এবং কারিগরি প্রভৃতি ধারা বিদ্যমান। এসব ভিন্ন ভিন্ন ধারার মাধ্যমে একই স্বাধীন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার মানুষ তৈরি হচ্ছে। পাকিস্তান আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার দাবিতে সংঘটিত বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং বুদ্ধিজীবীরা একই ধারার শিক্ষাব্যবস্থার দাবি জানিয়ে এসেছেন। দেশের শিক্ষানীতির সংস্কার এবং আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে দেশে এ যাবৎ অনেকগুলো শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। তবে তার কোনটিরই মতামত ও সুপারিশ পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করা হয় নি। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনামলে প্রবর্তিত যে শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের দেশে চলে আসছে সেটাই শিক্ষা ব্যবস্থা এ দেশে চালু নেই। সুতরাং বর্তমান পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য দেশে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম চালু এখন সময়ের দাবি।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞাকে সভাপতি করে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে। ২০০৪ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত এই কমিটির প্রতিবেদনে মাধ্যমিক পর্যায়ে একমুখী শিক্ষার প্রস্তুত করা হয়।^২ মিঞা কমিশনের সুপারিশের আলোকে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নবম ও দশম শ্রেণীতে ১৯৯৬ সালের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করে একটি যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম এবং

* প্রভাষক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

** একাডেমিক সুপারভাইজার, সেসিপ (SESIP), শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প, ঢাকা।

মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)কে দায়িত্ব প্রদান করে। এনসিটিবি বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (সেসিপ) এর আওতায় কতগুলো সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে। এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল: (১) পরীক্ষা সংস্কার কর্মসূচি, (২) পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বেসরকারিকরণ (৩) একমুখী শিক্ষাক্রম এবং (৪) স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন (এসবিএ) পদ্ধতি ইত্যাদি।

উক্ত সংস্কার কর্মসূচিগুলোর মধ্যে প্রথম দুটোর বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে শুরু হলেও প্রস্তুতবিত 'একমুখী শিক্ষাক্রম' চালুর পূর্ব মুহূর্তে এসে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অভাবে এবং প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের ব্যাপক সমালোচনার মুখে সরকার মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তভ্রমে আগামী এক বছরের জন্য একমুখী শিক্ষাক্রম স্থগিত করার ঘোষণা দেয়। উল্লেখ্য, মিএগ কমিশনের সুপারিশের আলোকে একমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের কথা বলা হলেও এখন থেকে প্রায় ৪৩ বছর পূর্বে ১৯৬৩ সাল পূর্ব সময়ে সাবেক পাকিস্তান আমলে আমাদের দেশে প্রবেশিকা পরীক্ষায় একমুখী শিক্ষাক্রম ব্যবস্থা চালু ছিল।

সারণি-১ এ একমুখী শিক্ষাক্রম সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হল।

সময়কাল	ঘটনা
১৯৬২	সর্বশেষ প্রবেশিকা (এসএসসি সমতুল্য) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
জানুয়ারি ২০০৩	সরকার জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩ গঠন করে।
মার্চ ২০০৪	কমিশন সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন পেশ করে।
এপ্রিল ২০০৪	নবম ও দশম শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এনসিটিবি-কে দায়িত্ব প্রদান করে।
১২ জুন ২০০৪	শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক স্তরের ২০০৬ সাল থেকে একমুখী শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
নভেম্বর ২০০৪	এনসিটিবি প্রস্তুতবিত একমুখী শিক্ষাক্রম প্রস্তুত করে।
৩১ জুলাই ২০০৫	শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিজ্ঞপ্তি জারি করে যে - ২০০৬ সাল থেকে নবম শ্রেণীতে একমুখী শিক্ষাক্রম বাস্তবায়িত হবে এবং ২০০৮ সালে একমুখী শিক্ষাক্রমের অধীনে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
৫ ডিসেম্বর ২০০৫	সরকার একমুখী শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়ন এক শিক্ষাবর্ষের জন্য পিছিয়ে দেয়।

একমুখী শিক্ষাক্রমের প্রস্তুতবিত এবং এর স্থগিত হওয়ার পর এযাবৎ এ সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা ও মতামত এসেছে। সকল আলোচনা-সমালোচনার মূলে ছিল-আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে একমুখী শিক্ষাক্রম প্রযোজ্য ও জরুরি কিনা, এটি মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে কতটা উপযুক্ত হবে, এটি গ্রাম ও শহরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করবে কিনা, সর্বোপরি প্রস্তুতবিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সমস্যা ও সমাধানের উপায় কী, এরূপ নানান ভাবনা। তবে, যে বিষয়গুলো এসব আলোচনাতে প্রতিভাত হয় তা হল - মাদ্রাসা শিক্ষা

ও কারিগরি শিক্ষা ধারাকে বাদ দিয়ে খস্টিভাবে শুধু সাধারণ শিক্ষায় একমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের বিষয়টি এবং বিজ্ঞান শিক্ষার অবমূল্যায়ন ও নিম্নমুখী করা এবং ব্যবসায় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্ভব। ধর্ম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বিষয় করার প্রসঙ্গটিও এসব আলোচনায় গুরুত্ব পায়। তাছাড়া মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এসবিএ পদ্ধতি নিয়ে নানা সংশয় ও উদ্বেগ শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই গবেষণাপত্রটি প্রস্ভবিত একমুখী শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত এসব ভাবনার জবাব দিয়ে সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষ তথা জাতিকে একটি দিকনির্দেশনা প্রদান করবে বলে আশা করা যায়।

২.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

নিম্নের উদ্দেশ্যসমূহ সম্পাদনের জন্য গবেষণাকর্মটি সম্পাদিত হয়।

- মাধ্যমিক স্ভুর প্রস্ভবিত একমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের পটভূমি তুলে ধরা।
- প্রচলিত ও প্রস্ভবিত শিক্ষাক্রমের মধ্যে তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা।
- প্রস্ভবিত শিক্ষাক্রমের নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করা।
- দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রস্ভবিত শিক্ষাক্রমের যথার্থতা যাচাই করা এবং
- প্রস্ভবিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সমস্যা নিরূপণ এবং সেগুলো সমাধানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

২.২ যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য নবম-দশম শ্রেণীতে একমুখী শিক্ষার প্রস্ভব করে বলে সরকার তা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত ড় নেয়। কিন্তু সরকার বিভিন্ন কারণে এটির বাস্তবায়ন এক বছরের জন্য স্থগিত করে। বিষয়টি বর্তমানে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। এর পক্ষে বিপক্ষে অনেক মতামত এসেছে। এখাতে ইতোমধ্যে সরকারি, বেসরকারি এবং বিদেশি উন্নয়ন সংস্থার বিপুল পরিমান অর্থ ও শ্রম ব্যয় হয়েছে এবং পাঠ্যপুস্তকের পাল্লিপি প্রস্তুত করা হয়েছে। এখন বিষয়টির ব্যাপারে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সংশি-ষ্ট অন্যান্য সকল সুযোগ-সুবিধার প্রেক্ষিতে প্রস্ভবিত একমুখী শিক্ষাক্রমের যথার্থতা যাচাই করা অত্যাবশ্যক। বিষয়টি নতুন হওয়ায় ইতোমধ্যে এ বিষয়ের ওপর কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে বলে জানা যায় নি। ফলে উপযুক্ত বিষয়ের ওপর সম্পাদিত এরূপ একটি গবেষণাপত্র উভয় শিক্ষাক্রমের মধ্যে যথার্থতা যাচাই করে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে ও পরিমার্জনে যথায়থ কর্তৃপক্ষের সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

২.৩ গবেষণা পদ্ধতি

মূলত প্রাপ্ত ও সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়। এ ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, সংশি-ষ্ট সাহিত্য, জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, সংশি-ষ্ট ওয়েব সাইট এবং প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞদের প্রদত্ত মতামত থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব বিষয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পাদনার পর গবেষণার উদ্দেশ্যবলির নিরিখে সিদ্ধান্ত ড় উপনীত হতে প্রচলিত ও প্রস্ভবিত শিক্ষাক্রমের বিষয় ও মানবণ্টন, সুবিধা-অসুবিধা, বর্তমান শিক্ষাক্রমের সীমাবদ্ধতা, একমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের যৌক্তিকতা; তথা উভয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক

আলোচনা করা হয়েছে। এরপর দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বিদ্যালয়ের অবস্থা এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিবেচনায় রেখে উভয় শিক্ষাক্রমের মধ্যে কোনটি তুলনামূলকভাবে উপযুক্ত তা আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। এবং একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের সমস্যা তুলে ধরে এর সমাধানে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। পরিশেষে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে করে যুগোপযোগী ও আধুনিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য সহজ ও সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমান গবেষণাটি ক্ষুদ্র পরিসরে সম্পাদিত হয়েছে। যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে আরো ব্যাপকভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজন।

২.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

সময়ের স্বল্পতার জন্য প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ না করে শুধুমাত্র সহায়ক দ্বিতীয় উৎস হতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বলে মাঠ পর্যায়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও দেশের উলে-খযোগ্য-সংখ্যক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরা সম্ভব হয় নি। প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে বিশেষত বিদ্যালয়ের এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রকৃত অবস্থা যাচাই করে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হলে আরো সুচারুভাবে উদ্দিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা সম্ভব হত; এতে করে গবেষণা কর্মটি আরো নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠত এবং মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আরো নতুন তথ্য ও সমস্যা সমাধানের পথ উদ্ঘাটিত হতে পারত। এছাড়াও বিষয়টি নতুন হওয়ায় এ বিষয়ে ইতোপূর্বে সম্পাদিত কোন গবেষণাকর্ম বা উদ্দিষ্ট বিষয়ের ওপর লিখিত কোন বই এর উদ্ধৃতি তুলে ধরাও যায় নি। এসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে প্রাপ্ত উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণাকর্মটি সম্পাদিত হয়েছে।

৩. ফলাফল বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

গবেষণা পত্রটিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর ফলাফল বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেগুলো হল: প্রচলিত ও প্রস্তুতকৃত শিক্ষাক্রমের মধ্যে তুলনা করা, মাধ্যমিক স্তরের প্রস্তুতকৃত শিক্ষাক্রমের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা, প্রস্তুতকৃত শিক্ষাক্রমের সুবিধা ও সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা করে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রস্তুতকৃত শিক্ষাক্রমের যথার্থতা যাচাই করা। নিচে পর্যায়ক্রমে এগুলো উপস্থাপন করা হল:

৩.১ প্রচলিত ও প্রস্তুতকৃত শিক্ষাক্রমের মধ্যে তুলনা

প্রচলিত শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের পাঁচটি আবশ্যিক বিষয়ে ৭০০ নম্বরসহ মোট ১১০০ নম্বরের পাঠ্য বিষয় পড়তে হচ্ছে। প্রস্তুতকৃত একমুখী শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ৭টি আবশ্যিক বিষয়ে ১০০০ নম্বরসহ মোট ১২শ' নম্বরের পাঠ্য বিষয় পড়তে হবে। আবশ্যিক করা হয়েছে সাধারণ বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষাকে। ধর্ম শিক্ষা আগেও বাধ্যমামূলক ছিল, এখনও তা অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে ধর্ম শিক্ষাকে আবশ্যিক রেখে এর সঙ্গে ভাষা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সারণি-২ এ বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের সাথে প্রস্তুতকৃত একমুখী শিক্ষাক্রমের বিষয়সমূহ এবং নম্বর বন্টনের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল।

সারণি-২: বর্তমানে প্রচলিত ও প্রস্তুতকৃত শিক্ষাক্রমের বিষয় নির্বাচন ও নম্বর বণ্টন

বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাক্রম ^১				প্রস্তুতবিহীন একমুখী শিক্ষাক্রম ^২			
ক্রমিক নং	বিষয় সমূহ		নম্বর	ক্রমিক নং	বিষয় সমূহ		নম্বর
১	পাঁচটি আবশ্যিক বিষয়	বাংলা	২০০	১	সাতটি আবশ্যিক বিষয়	বাংলা	২০০
২		ইংরেজি	২০০	২		ইংরেজি	২০০
৩		গণিত	১০০	৩		গণিত	১০০
৪		ধর্ম শিক্ষা	১০০	৪		সাধারণ বিজ্ঞান	১৫০
৫		সামাজিক বিজ্ঞান (বিজ্ঞান বিভাগের জন্য) / সাধারণ বিজ্ঞান (কলা ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য)	১০০			৫	সামাজিক বিজ্ঞান (ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি / পৌরনীতি)
৬	বিজ্ঞান	পদার্থ বিদ্যা	১০০ + ১০০ + ১০০	৬	ব্যবসায় শিক্ষা		১০০
		রসায়ন বিদ্যা					
৭		কলা				জীব বিদ্যা / উচ্চতর গণিত	
	ভূগোল		৭	ধর্ম শিক্ষা	১০০		
	ইতিহাস						
৮	বাণিজ্য	অর্থনীতি/ পৌরনীতি				৮	নৈর্ব্যচনিক বিষয় (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা,গার্হস্থ্য অর্থনীতি)
		ব্যবসায় পরিচিতি					
		একাউন্টিং					
৯	একটি অতিরিক্ত বিষয় (উচ্চতর গণিত, কম্পিউটার শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, বেসিক ট্রেড, মিউজিক, আর্ট ও কালচার, শারিরীক শিক্ষা, প্রভৃতি)	১০০	৯	একটি অতিরিক্ত বিষয় (উচ্চতর গণিত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বাণিজ্যিক ভূগোল, বেসিক ট্রেড, মিউজিক, আর্ট ও কালচার, শারিরীক শিক্ষা, প্রভৃতি)	১০০		
মোট		১১০০	মোট		১২০০		

এ পদ্ধতি বাস্তবায়িত হলে নবম ও দশম শ্রেণীতে আর কোন বিভাগ বিভাজন (মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা) থাকবে না। সব শিক্ষার্থীকে অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করতে হবে। ১০০ নম্বর ‘আবশ্যিক নৈর্ব্যচনিক’ বিষয় হিসেবে শিক্ষার্থীকে ৩টি বিষয়ের মধ্য থেকে একটি বিষয় বেছে নিতেই হবে। আর একটি ‘ঐচ্ছিক বিষয়ের’ জন্য ১০০ নম্বর বেছে নিতেও পারে আবার নাও নিতে পারে। সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ে ১৫০ নম্বরের মধ্যে পদার্থ ও রসায়ন নিয়ে ভৌতবিজ্ঞানে ৭৫ নম্বর এবং উদ্ভিদ, প্রাণী, পরিবেশ বিজ্ঞান ও জনসংখ্যা শিক্ষা নিয়ে জীববিজ্ঞানে ৭৫ নম্বর রাখা হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে ১৫০ নম্বরের মধ্যে ইতিহাস ও ভূগোল নিয়ে প্রথমপত্রে ৭৫ নম্বর, দ্বিতীয় পত্রে অর্থনীতি, পৌরনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে ৭৫ নম্বর এবং ব্যবসায় শিক্ষায় ১০০ নম্বর আবশ্যিক করা হয়েছে।^৫

প্রস্তুতবিত একমুখী শিক্ষাক্রমের অধীনে শিক্ষার্থীদেরকে কাঠামোবদ্ধ (স্ট্রাকচার্ড) প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এ পদ্ধতিতে একটি বিষয়ের ওপর বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হবে। এছাড়া একমুখী শিক্ষাক্রমে পূর্বের শিক্ষাক্রমের রচনামূলক প্রশ্নে ৫০ নম্বরের স্থলে ৬০ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আর বহু-নৈর্ব্যচনিক (এমসিকিউ) প্রশ্নে পূর্বের ৫০ নম্বরের স্থলে ৪০ নম্বর রাখার প্রস্তুত করা হয়েছে, এই ৪০ নম্বরের জন্য ৪০ মিনিট সময় প্রদান করা হবে। তবে সাধারণ গণিত, উচ্চতর গণিত, ইংরেজি দুই পত্রে এবং বাংলা দ্বিতীয় পত্রে এই কাঠামো প্রযোজ্য হবে না। প্রস্তুতবিত শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদেরকে নয়টি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মধ্যে ছয়টির উত্তর দিতে দুই ঘণ্টা দশ মিনিট সময় প্রদান করা হবে। দশম শ্রেণীর পর চূড়াল্ড সাধারণ পরীক্ষার পাশাপাশি বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন বা এসবিএ পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের শ্রেণী শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষকদের হাতে ৩০ শতাংশ নম্বর থাকবে।^১

৩.২ একমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিক স্কুলের কেন্দ্রবিন্দুতে অর্থাৎ নবম শ্রেণীতে পদার্পণের গুরুত্বই ১৩-১৪ বছর বয়সী একজন শিক্ষার্থীকে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য এই তিনটি শাখার যে-কোন একটি বেছে নিতে হয়। কিন্তু এই বয়সটি সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মোটেই পরিণত নয় বলে একমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের যুক্তি হিসেবে উলে-খ করা হয়েছে। নিয়মানুযায়ী, শ্রেণীর পাঠদান শুরু হওয়ার পর এক থেকে দুই মাস পর বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে ভর্তিচছুক শিক্ষার্থীদের জন্য একটি পরীক্ষার মাধ্যমে শাখা নির্বাচন করা। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষক অথবা অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভাগ নির্বাচন করে থাকে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভুল সিদ্ধান্তটি নিয়ে থাকে। অথচ একমুখী শিক্ষাক্রমে নবম-দশম শ্রেণীতে যে শিক্ষাক্রম সন্নিবেশ করা হয়েছে তাতে পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের পাঠ্যসূচির সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। এর ফলে অপ্রাপ্ত বয়সে শিক্ষার্থীদের বিভাগ নির্ণয়ে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থেকে মাধ্যমিক স্কুলে অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে বুঝে-শুনে বিভাগ নির্ণয়ের সুবিধা পাবে বলে আশা করা যায়।

এসসিটিবি প্রকাশিত পুন্ডিঙ্কায় একমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তন প্রসঙ্গে যে-সব যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে - বর্তমান শিক্ষাক্রমের আওতায় রচিত পাঠ্যসূচির বিষয়গুলো অনেকটা মুখস্থ-নির্ভর। এটি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল এবং নিজস্ব চিন্তা-চেতনা শক্তির বিকাশ ঘটায় খুব সামান্যই। ফলে প্রতিবছর গতানুগতিক ধারায় প্রায় একই রকমের প্রশ্ন থাকায় শিক্ষার্থীরা বুঝে-না বুঝে অনেকটা উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লিখে দিয়ে আসতে পারলেই সাফল্য বোধ করে। আবার অনেকেই পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে গাইড বই কিংবা নকল নির্ভর হয়ে পড়ে। অতি সম্প্রতি নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে তার সাফল্য ধরে রাখার জন্য একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা করা হয় বলে উলে-খ করা হয়েছে। সুতরাং প্রস্তুতবিত একমুখী শিক্ষাক্রমে রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার উদ্ভব ঘটানোর পাশাপাশি জাতিকে নকলের অভিশাপ থেকে মুক্ত করবে বলে আশা করা হয়। বর্তমান শিক্ষাক্রমের আওতায় দশম শ্রেণী শেষে একটি মাত্র চূড়াল্ড পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনফল ও মেধা যাচাই করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের মানবিক ও সামাজিক আচরণগুলো যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না। সার্বিকভাবে তাদের কাক্ষিত আচরণগুলো যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় না বলে এই পরিবর্তনগুলো

স্থায়ী হয় না।^১ পরীক্ষা না থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা বছরের অনেক সময়ই পড়ার প্রতি অমনযোগী থাকে। এমনকি শিক্ষার্থীদের অনেকেই সারা বছর শ্রেণীতে উপস্থিত হয় না। কিন্তু পরীক্ষার আগে বাজার থেকে কেনা গাইড কিংবা প্রাইভেট শিক্ষকের দেয়া হ্যান্ডনোট পড়ে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে, অনেকে ভাল গ্রেডও অর্জন করে। আবার অনেক অভিাবককে পরীক্ষার সময় ছাড়া বছরের অন্যান্য সময়গুলোতে ছেলে-মেয়েকে বিদ্যালয়ের পরিবর্তে কাজে পাঠানোর প্রবণতা এবং অবহেলা করতে দেখা যায়। ফলে শিক্ষার্থীরা সারা বছর সযত্ন ও পরিচর্যা হতে বঞ্চিত হয়। আবার দুই বছর পর একসাথে এগারটি বিষয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে পঠিত সবগুলো বিষয় রিভিশন দিয়ে আত্মস্বত্ব করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি অনেক পাঠ তারা দেখারও সময় পায় না। একসঙ্গে সার্বিক মূল্যায়ন করা হয় বলে শেখার প্রতি তাদের দীর্ঘ মেয়াদী প্রচেষ্টা থাকে না; বরং পরীক্ষার পূর্বে পাঠ গলাধঃকরণে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল আসলেও অনেক সময় কাক্ষিত শিখনফল অর্জিত হয় না।

বর্তমান শিক্ষাক্রমে বিভাগ বিভাজনের (বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক) কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে যা সামাজিক সুষ্ঠু বিকাশে সহায়ক হচ্ছে না। এই ত্রিবিধ শাখার সিলেবাসের মধ্যে এতটা পার্থক্য রয়েছে যে, তিনটি শাখায় লেখাপড়া করার কারণে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষি, শিল্প ও সংস্কৃতি, ব্যবসায় নীতি, ভৌগোলিক ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কে জানে না, আবার মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে না। ফলে তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় বৈষম্য এবং গড়ে ওঠে ভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি। প্রস্তুতিবিত শিক্ষাক্রম সেটি রোধ করে সকল শিক্ষার্থীর মাঝে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। কারণ শুধু বিজ্ঞান, মানবিক কিংবা বাণিজ্য বিভাগ পড়লে শিক্ষার্থীদের মধ্যে খণ্ডিত জ্ঞান গড়ে ওঠে। প্রস্তুতিবিত শিক্ষাক্রমে বিষয়বস্তুগুলোর শিখনফল এমনভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিক, সামাজিক, চিন্তা, বিশেষ-ঘণ, যোগাযোগ, সহযোগিতামূলক এই ছয়টি দক্ষতাসম্পন্ন একজন পরিপূর্ণ ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। ফলে সহনশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, জাতি, গোত্র ও লিঙ্গভেদে বৈষম্যহীন দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য একমুখী শিক্ষাক্রম সহায়ক হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রচলিত শিক্ষাক্রমের নিয়মানুযায়ী মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে শাখা পরিবর্তন করে মানবিক কিংবা বাণিজ্য শাখায় ভর্তি হতে পারলেও অন্য শাখার শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারে না; যদিও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা সীমিত হারে বাণিজ্য শাখায় ভর্তির সুযোগ পায়। উচ্চতর, কারিগরি এবং বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন: মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক, লেদার টেকনোলজি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই বৈষম্য অতি প্রকট। মাধ্যমিক শ্রেণীতে মানবিক ও বাণিজ্য শাখার একজন শিক্ষার্থী যত ভাল ফলই করুক না কেন সে কখনো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার বিজ্ঞানী বা ফার্মাসিস্ট হতে পারবে না। ফলে অনেক সময় দেখা যায়, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা বাধ্য হয়ে কোন ছাত্র যখন মাধ্যমিক শ্রেণীতে মানবিক বা বাণিজ্য শাখায় ভর্তি হয় তখন তার জন্য পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট যে কোন ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বিজ্ঞান শাখার একজন শিক্ষার্থী শিক্ষাজীবনের যে-কোন পর্যায়ে যে-কোন শাখা ও বিষয়ে পড়ালেখা করার সুযোগ পায়। আবার এর বিপরীত চিত্রও দেখা যায়। কারো কারো প্ররোচনায় অনেক মধ্যম মানের শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শ্রেণীতে

বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পেরিয়ে উচ্চ শিক্ষার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার সুযোগ পর্যন্ত পায় না। কিন্তু বিদেশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এরূপ সীমাবদ্ধতা না থাকায় দেশে বড় রকমের মেধা পাচারের ঘটনা ঘটে। এসব সমস্যা বিবেচনায় এনে প্রস্তুতবিত একমুখী শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিক শ্রেণীতে আলাদা শাখা না রেখে সবার জন্য একটি কমন শাখার প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে করে শিক্ষার্থীরা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির সময় তার পূর্ববর্তী ফলাফল ও লক্ষ্য অনুযায়ী শাখা নির্বাচনের সুযোগ পাবে। আবার মানবিক ও বাণিজ্য শাখার সাধারণ বিষয়াদি যেমন: দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন ভিন্ন সহায়ক পুস্তক, গল্প, উপন্যাস, পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি মাধ্যম হতে জানা যায়। কিন্তু বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার মৌলিক বিষয়াদি যেমন: পরমাণুর গঠন, প্রটোন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ইলেক্ট্রনের পরিভ্রমণ, পদার্থের দৃঢ়তা ও ভঙ্গুরতা, মাবনদেহের গঠন ও কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয় গল্প, উপন্যাস, পত্র-পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশন প্রভৃতি মাধ্যম হতে জানা যায় না। ফলে বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের তুলনায় ভর্তি, চাকুরি, পদোন্নতিসহ বিভিন্ন প্রত্যোগিতামূলক পরীক্ষায় মানবিক ও বাণিজ্য শাখার শিক্ষার্থীরা উলে- খযোগ্য হারে পিছিয়ে পড়ে। এই কথাটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজ্য তাদের ক্ষেত্রে যেসব শিক্ষার্থী আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এসএসসি পরীক্ষার পর কর্মে নিয়োজিত হয়। কারণ, শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অসুদৃঢ় জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে এই পর্যায়ে হতে কর্মে নিয়োজিত হয়ে তারা যেমনিভাবে নিজদেরকে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে না তেমনিভাবে ভিন্ন যোগ্যতার কারণে বৈষম্যেরও শিকার হয়। জনসংখ্যার বিশাল এই অংশের কথা বিবেচনায় এনে দেশের সকল শিক্ষার্থীকে ভর্তি, চাকুরি, পদোন্নতিসহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমহারে সুযোগ-সুবিধার সুখ বণ্টনের লক্ষ্যে একমুখী শিক্ষাক্রম প্রস্তুত করা হয়।

৩.৩ প্রস্তুতবিত একমুখী শিক্ষাক্রম: বিবেচ্য দিকসমূহ

প্রচলিত শিক্ষাক্রমে উচ্চ শিক্ষাস্তরে প্রবেশের আগে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক এরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগভিত্তিক বিভাজনের ফলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে যে ধরনের বৈপরীত্য সৃষ্টি হচ্ছে বলে অনেকের ধারণা, প্রস্তুতবিত একমুখী শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে তা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। কারণ একমুখী শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্ন শাখা থাকবে না, সব শাখার সংমিশ্রণে একটিমাত্র শাখায় সবাইকে একই বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করতে হবে ফলে, তারা দেশ, বিশ্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক, সামাজিক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ইতিহাস, ভূগোল, বাণিজ্য, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে। ভর্তি, চাকুরি, ইত্যাদি বিভিন্ন প্রত্যোগিতামূলক পরীক্ষায় সমান সুযোগ লাভে সক্ষম হবে। আশা করা যায় এতে তারা পরবর্তী সময়ে সবার জন্য নিজ নিজ ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ফলে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষ সবার মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিকতা, দেশপ্রেম এবং সেবামূলক মনোভাব বৃদ্ধি পাবে।

প্রচলিত শিক্ষাক্রমের নিয়মানুযায়ী মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে শাখা পরিবর্তন করে মানবিক কিংবা বাণিজ্য শাখায় ভর্তির জন্য বিবেচিত হলেও মানবিক ও বাণিজ্য শাখার শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান শাখায় ভর্তির জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়; যদিও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা সীমিত হারে বাণিজ্য শাখায় ভর্তির সুযোগ পায়। উচ্চতর, কারিগরি এবং বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন- মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক, লেদার

টেকনোলজি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই বৈষম্য অতি প্রকট। মাধ্যমিক শ্রেণীতে মানবিক ও বাণিজ্য শাখার একজন শিক্ষার্থী যত ভাল ফলই করুক না কেন সে কখনো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার বিজ্ঞানী বা ফার্মাসিস্ট হতে পারবে না। কিন্তু বিজ্ঞান শাখার একজন শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবনের যে-কোন পর্যায়ে যে কোন শাখা ও বিষয়ে পড়ালেখা করার সুযোগ পায়। আবার এর বিপরীত চিত্রও দেখা যায়। অভিভাবক, শিক্ষক বা বন্ধুদের প্রভাবে অনেক মধ্যম মানের শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শ্রেণীতে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হয়ে তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটি করে থাকে। এদের অনেকেই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পেরিয়ে উচ্চ শিক্ষার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার সুযোগ পর্যন্ত পায় না। প্রস্তুতবিত একমুখী শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিক শ্রেণীর পর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির সময় তার পূর্ববর্তী ফলাফল ও লক্ষ্য অনুযায়ী শাখা নির্বাচনের সুযোগ পাবে, ফলে এসব সমস্যার মুখোমুখি তারা হবে না।

প্রস্তুতবিত একমুখী শিক্ষাক্রমের আওতায় রচিত পাঠ্যপুস্তকের পাভুলিপিতে প্রতিটি পাঠ দেড় থেকে সর্বোচ্চ দুই পৃষ্ঠার মধ্যে বিভাজিত থাকায় শ্রেণী শিক্ষকদের যেমন পাঠদানে সুবিধা হবে; অপরদিকে পাঠ ফাঁকি দেওয়ার তেমন কোন সুযোগ থাকবে না। শিক্ষার্থীরাও পাঠ অনুযায়ী প্রতিদিনের পড়া প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে। এছাড়াও প্রক্ষাবিত শিক্ষাক্রমে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে বলে শিক্ষার্থীরা নকলের সুযোগ পাবে না। কারণ এরকম প্রশ্নের উত্তর সরাসরি বইতে পাওয়া যাবে না, বরং বই পড়া থাকলেই কেবল প্রশ্ন বুঝে উত্তর দেয়া যাবে।^১ এভাবে শিক্ষার্থীর মনোপেশীজ দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে তারা শিখনফল কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবে।

স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন (এসবিএ) প্রক্রিয়ায় শিক্ষাক্রমে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয়। এটি সারা শিক্ষা-বছরে শিক্ষাদান কর্মসূচির অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক গঠনমূলক ও চূড়ান্ত যাচাইয়ের ব্যবস্থা। এতে বছরে কেবল একবার বা দু'বার লিখিত পরীক্ষার পরিবর্তে শিক্ষক সমগ্র বছরব্যাপী শিক্ষার্থীর মননশীল, আবেগিক ও মনোপেশীজ দক্ষতার সার্বিক মূল্যায়ন করতে প্রয়াস পান। ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলে, বছরান্তে স্কুলে গৃহীত বার্ষিক ফাইনাল বা দশম শ্রেণীর শেষে বোর্ড কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত চূড়ান্ত পরীক্ষার অনেক আগেই শিক্ষক তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্বলতাগুলো যেমন চিহ্নিত করতে পারবেন তেমনি শিক্ষার্থীরাও তাদের ঘাটতিগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে। ফলে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পাসের হার অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।^২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ দেশ-বিদেশের অনেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এসবিএ পদ্ধতি চালু আছে। মাধ্যমিক শ্রেণীতেও এটি সম্পূর্ণ নতুন কোন বিষয় নয়। বর্তমান শিক্ষাক্রমেই বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়সমূহের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষায় ২৫ শতাংশ নম্বর শিক্ষকদের হাতে বরাদ্দ আছে। যদিও কোন কোন বিদ্যালয়ে বা বিশেষ কোন শিক্ষার্থীকে তার যোগ্যতার চেয়ে বেশি নম্বর দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তাই বলে ব্যবহারিক পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া কিংবা ব্যবহারিক পরীক্ষায় স্থানীয় শিক্ষকদের দ্বারা নম্বর প্রদান বন্ধ করার দাবি ওঠেনি কখনো। দলীয় চাপ না থাকলে বিদ্যালয়ের সাধারণ একজন শিক্ষকদের দ্বারাও প্রায় সঠিক নিয়মে মানবণ্টন করা সম্ভব। আর শিক্ষার্থীদের নবম-দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় বিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে পরিচালিত পরীক্ষার ফলাফলে খুব একটা অনিয়ম বা আপত্তি হওয়ার কথা নয়। কারণ যে-কোন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ক্লাসে ১ম, ২য়, ৩য় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, গৌরব এবং সচেতনতা ছাত্র-অভিভাবক সবার মধ্যেই আছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বড় কোন অনিয়ম হওয়ার আশঙ্কা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কিন্তু এই পদ্ধতির ভালো দিকগুলো সম্পর্কে অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের

পরীক্ষার ধারণা না দেওয়ায় তাদের মধ্যে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে।

৩.৪ প্রস্তুতবিত একমুখী শিক্ষাক্রমের সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়নের সমস্যা

প্রস্তুতবিত একমুখী শিক্ষাক্রমে বাস্তবায়নের প্রধান সমস্যা হল বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিদ্যালয়গুলো অবকাঠামোগত এবং বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত শ্রেণী শিক্ষকের অভাব। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, দেশের মোট ১৬১৬৬টি^{১০} মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলের মধ্যে এখনও ৭৬০০ স্কুলে বাণিজ্য বিভাগ নেই, ১৫০০ স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ নেই। কিন্তু একমুখী শিক্ষাক্রম চালু হলে একটি বিদ্যালয়ে একই সঙ্গে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্যের শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। অথচ দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে একইসঙ্গে সব বিষয়ের শিক্ষক নেই। যে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান নেই এখন তাদেরকেও বিজ্ঞান পড়াতে হবে। আবার অনেক বিদ্যালয়ে ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত ও বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক থাকলেও একমুখী শিক্ষাক্রম সম্পর্কে তাদের নেই কোন প্রশিক্ষণ এবং ন্যূনতম ধারণা। সুতরাং এতসব ঘটতির মধ্যে একমুখী শিক্ষাক্রম চালু করলে তা অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করবে বলে সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সারাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার অবকাঠামোগত দুর্বলতা বলাই বাহুল্য। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র শিক্ষার্থী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান গ্রাস্পে পড়তে পারে না স্রেফ সুযোগের অভাবে। এছাড়া প্রাইভেট পড়া এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ নির্বাহ করতে তারা অক্ষম। এ অসুবিধাগুলো দূর করার কোন পদক্ষেপ না নিয়ে সবার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা চালুর ফল ভয়াবহ হতে পারে।^{১১} কারণ দুর্বল ও দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ভাবে প্রাইভেট পড়া ছাড়া বিজ্ঞানে ভাল করা সম্ভব নয়; এই ধারণায় তারা বিজ্ঞান থেকে দূরে থাকবে। ফলে শিক্ষায় ড্রপ-আউট এবং পাবলিক পরীক্ষায় ফেলের হার বাড়তে পারে।

বর্তমান ব্যবস্থায় অষ্টম শ্রেণীর পর বিজ্ঞান শাখার নবম দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চার বছর বিজ্ঞান পড়ে তারপর একজন শিক্ষার্থী মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মেসি বা মাইক্রোবায়োলজি বা এগ্রিকালচারে যাচ্ছে। চার বছর বিজ্ঞান স্পেশালি পড়ার পর ওখানে গিয়ে তারা ধাক্কা খাচ্ছে। মেডিকলে ভর্তির পর ছাত্র-ছাত্রীদের মাথা পাগলের মতো হয়ে যায়। চার বছর পড়ানোর পর যেখানে যথেষ্ট হচ্ছে না, সেখানে দু বছর বিজ্ঞান পড়ালে তো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কিছুই পারবে না।^{১২}

প্রস্তুতবিত একমুখী শিক্ষাক্রমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত, সমাজ, ভূগোল, ধর্ম, ব্যবসায় শিক্ষাসহ একসাথে অনেকগুলো বিষয় অধ্যয়ন করতে হবে। ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও গরিব শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক স্তরের পূর্বেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বারে পড়তে পারে। বিশেষ করে, গ্রাম এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যেখানে অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রকট সংকট রয়েছে সেখানে পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষাদান দুরূহ হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। এসব এলাকার শিক্ষার্থীরা না পাবে কোন ভাল শিক্ষক, না পাবে গৃহ শিক্ষকের সুবিধা কিংবা ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়সমূহের পরীক্ষণ সুবিধা। ফলে শহুরে শিক্ষার্থীদের তুলনায় গ্রাম্য শিক্ষার্থীরা পরবর্তী সময়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং চাকুরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনেকাংশে পিছিয়ে পড়তে পারে। অনেকের মতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে বর্তমান যুগ স্পেশলাইজডের (বিশেষায়িত) যুগ।^{১৩} একমুখী শিক্ষায় অনেক বিষয় একসঙ্গে পড়ানোর কারণে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষায়িত না হয়ে সরলীকৃত হতে পারে বলে অনেকের বিশ্বাস।

প্রস্তুতবিত একমুখী শিক্ষাক্রমে ধর্ম শিক্ষা পূর্বের মতই আবশ্যিক রাখা হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে

আরবি, সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষা শেখার বাড়তি বোঝা। অনেকের অভিযোগ শিক্ষার্থীদের ওপর অযৌক্তিকভাবে ভাষা-শিক্ষা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কারণ ধর্ম-শিক্ষা আর ভাষা-শিক্ষা এক নয়। নতুন ভাষা শেখা একটা শিক্ষা স্ফুর্তী যেখানে সম্ভব নয় সেখানে সপ্তাহে মাত্র তিনটি পিরিয়ড পড়ে কিভাবে নতুন একটি ভাষা শিখবে তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।^{১৪} উপরন্তু প্রায় সব বিদ্যালয়েই ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের কোন শিক্ষক নেই। সব ভাষার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভবও নয়। তাহলে বিভিন্ন ধর্মের ভাষা-শিক্ষার মত কঠিন বিষয় একজন সাধারণ শিক্ষক কীভাবে সব ভাষা শেখাবেন। আবার খ্রিস্টান বা জৈন ধর্মের শিক্ষার্থীরা কোন ভাষা শিখবে তাও নতুন শিক্ষাক্রমে বলা হয় নি। সুতরাং এমন মনস্তাত্ত্বিক জটিল বিষয়ের সুরাহা প্রস্তুত শিক্ষাক্রমে বলা হয় নি।

নতুন শিক্ষাক্রমের প্রস্তুত করায় অনেক শিক্ষক ভাবছেন নতুন এই সংস্কার কর্মসূচির জন্য তাদের অনেকেই চাকুরি হারাবেন। কারণ, কোন বিদ্যালয়ে হয়ত ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক বেশি, সেখানে মানবিক বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ করা হবে এবং তারা অনেকেই বাতিল হয়ে যেতে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন। যে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কিংবা মানবিক বিষয়ের শিক্ষক বেশি ছিল একই ভয় তাঁদেরও। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। কোনো শিক্ষার্থীর ইচ্ছা না থাকলেও তাকে ১২০০ নম্বরের ১৮টি বিষয় পড়তে হবে।^{১৫} সাধারণভাবে তারা ভাবছে, আগের চেয়ে সিলেবাস বড় হবে, অনেক বিষয় পড়তে হবে, পড়াশোনা কঠিন হয়ে যাবে। যার কারণে নতুন শিক্ষাক্রম চালু করার পূর্বেই শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।^{১৬}

এসবিএ পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের ফলে দেশে প্রাইভেট/কোচিং কালচার বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ হয়ে যেতে পারে। আবার কোন কোন শিক্ষক প্রতিষ্ঠানভেদে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের কাছে জিম্মি হয়ে পড়বেন বলে আশংকা করা হচ্ছে। কারণ আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অতিরিক্ত নম্বরের জন্য রাজনৈতিক চাপ আসার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষায় অনেক শিক্ষার্থী ২৫ নম্বরের মধ্যে ২৫ বা ২৪ নম্বর পেলেও অবশিষ্ট ৭৫ নম্বরের মধ্যে পাস নম্বর এমনকি ১০ শতাংশ নম্বরও অর্জন করতে পারে না। এছাড়াও বর্তমানে এবিষয়ে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল শিক্ষকরা পদ্ধতিটির ব্যাপারে প্রশিক্ষিত নয়। ফলে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ছাড়া এসবিএ পদ্ধতিতে শিক্ষকরা কীভাবে মূল্যায়ন করবেন সে বিষয় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। সুতরাং এসব সংকীর্ণতা, রাজনৈতিক চাপ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের মত সংকট দূর না করে এই পদ্ধতি এই মুহূর্তে চালু করা সমীচীন হবে না। আবার নবম-দশম শ্রেণীতে একই সময়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রী শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকবে বিধায় শিক্ষকদের পক্ষে শিখনফল কতটা অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে এসবিএ পদ্ধতি সমালোচনার মুখে পড়তে পারে।

আমাদের শিক্ষাটা কর্মবিমুখ, পঞ্চম বা অষ্টম শ্রেণী পাস করে কেউ কাজে যেতে চায় না বা ভোকেশনাল ট্রেনিং নিতে চায় না। কর্মমুখী শিক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ শেখানো যায়। এ ধরনের মনোবৃত্তি যদি সাধারণ শিক্ষায়ও গড়ে তুলতে পারা যায় তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময়ে তারা যখন ‘ওয়ার্ল্ড অব ওয়ার্ক’ যাবে শিক্ষার্থীরা তখন ছয় মাস/এক বছরের ভোকেশনাল ট্রেনিং নিয়ে তারা ভালো কর্মী হয়ে যাবে। এটার সুযোগ কর্মমুখী শিক্ষায় রয়েছে। কিন্তু একমুখী শিক্ষাক্রমে বাধ্যতামূলক ব্যবসায় শিক্ষায় এই সুযোগ দিচ্ছে না।^{১৭}

একমুখী শিক্ষাক্রমে মাদ্রাসা, কারিগরি ও ইংরেজি মাধ্যমকে স্পর্শ না করে শুধু সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা

ব্যবস্থার পরিবর্তন করার প্রস্তুত করা হয়েছে। অথচ যখন বলা হয় একমুখী শিক্ষা তখন ধরে নেয়া হয় মাদ্রাসা শিক্ষা, ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা কিংবা সাধারণ শিক্ষাকে এক ধারায় নিয়ে আসা হবে। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। এখন তো মাদ্রাসা শিক্ষাও থাকছে ইংরেজি শিক্ষাও থাকছে। তাহলে সেটা একমুখী কী করে হলো এ বিষয়ে রয়েছে অনেকের আপত্তি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এরূপ বিভিন্ন আপত্তিকর বিষয় এবং আমাদের দেশের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এসব পদ্ধতিসহ নানাবিধ সমস্যা থাকার কারণে একমুখী শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এসব সমস্যা দূর করতে না পারলে এ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করলেও এর সুফল পাওয়া সম্ভব হবে না।

৪. সুপারিশমালা

একটি নতুন শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়ন শুরু করার জন্য সর্বপ্রথম যে জিনিসটির প্রয়োজন সেটি হলো- ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবদের মধ্যে এর উল্লেখযোগ্য সুবিধাসমূহ তুলে ধরা। বিশেষ করে এটির মূল বাস্তবায়নকারী তথা শিক্ষকদের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয় নি। তদুপরি, দেশের বিপুল সংখ্যক বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ পড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। সুতরাং প্রস্তুতকৃত শিক্ষাক্রম চালু করতে হলে আগে এসব বিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞানের শিক্ষক নিয়োগদানের পাশাপাশি নতুন এবং পুরাতন সকল শিক্ষকদের একমুখী শিক্ষাক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। নয়ত এ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় হযবরল অবস্থার সৃষ্টি হবে।

একমুখী শিক্ষাক্রম চালু করতে হলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপকরণ ও শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারণের বিষয়টি বিবেচনায় এনে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এজন্য শ্রেণীকক্ষের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করতে হবে। শ্রেণীকক্ষের আকার বৃদ্ধি করতে হবে এবং আসবাবপত্রেরও পরিবর্তন ঘটাতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে বিভক্ত হয়ে কাজ করতে পারে। পাশাপাশি যেসব বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ নেই সেখানে ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য জরুরি ভিত্তিতে বিজ্ঞানাগার স্থাপন করতে হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি প্রিন্টারসহ ন্যূনতম পাঁচটি করে উন্নতমানের কম্পিউটার প্রদান করতে হবে। সর্বোপরি পাঠাগারসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণে সহায়ক পুস্তক সরবরাহ করে বিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দেশের বিপুল সংখ্যক বিদ্যালয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া সম্ভব না হলে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় আবশ্যিকের পরিবর্তে নৈর্ব্যচনিক বিষয় হিসেবে রাখা যেতে পারে। আর ধর্ম শিক্ষার সাথে আরবি ও অন্যান্য ভাষা শিক্ষার কাজ শিক্ষার্থীদের জন্য একটা বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে পারে বলে ভাষা-শিক্ষা অংশ বাদ দিয়ে ১০০ নম্বরের ধর্মশিক্ষার পরিবর্তে ৫০ নম্বর করা যেতে পারে।

এসব পদ্ধতি চালুর আগে এর সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। শিক্ষার্থী অনুপাতে বাংলা এবং ইংরেজি বিষয়ের মতো অন্যান্য বিষয়ের একাধিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। অন্যথায় এ পদ্ধতিতে সহযোগিতামূলক দক্ষতা, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দক্ষতা, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা কতটুকু অর্জন করেছে তা যথাযথ মূল্যায়ন করা শিক্ষকদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে এসব পদ্ধতিতে ৩০ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ নম্বর বরাদ্দ করা যুক্তিযুক্ত হতে পারে। এ পদ্ধতির অধিকতর স্বচ্ছতার জন্য উপজেলা পর্যায়ে একই

প্রশ্নপ্রত্নে পরীক্ষা নিয়ে উপজেলার মধ্যে বহিঃপরীক্ষক দ্বারা নবম ও দশম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করা যেতে পারে। প্রয়োজনে ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শ্রেণী থেকে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। যদি তা ফলপ্রসূ বলে মনে হয় তাহলে তা নবম-দশম শ্রেণীতে প্রয়োগ করা সহজ হবে। কারণ বোর্ড পরীক্ষাতে যে কোন নিয়ম প্রয়োগ করার পূর্বে তা যাচাই করে নেওয়া উচিত।

প্রকৃত একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পর্যায়ক্রমে দেশের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, মাদ্রাসা, ক্যাডেট স্কুল, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রভৃতিকে একধারায় নিয়ে আসতে হবে। এসব ধারা অপরিবর্তিত রেখে শুধু সাধারণ স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীতে এই বিষয়গুচ্ছ চালু করলেই একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণতা আসবে না। সুতরাং তিন-চার ধারার শিক্ষা একটা স্ফুট পর্যন্ত একমুখী থাকাটা বিজ্ঞানসম্মত হবে। নতুবা আমাদের যে বিভেদ, হিংসা, হানাহানির একটা দেয়াল সৃষ্টি হয়ে আছে সেটা আরো শক্তিশালী হবে।”

শিক্ষা সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে, আগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খুব বেশি প্রয়োজন কোনটা। বিশ্ব পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিমার্জন ও সংস্কার হওয়া দরকার। কিন্তু এই প্রয়োজনটা আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, স্কুলের অবস্থা, শিক্ষকের অবস্থা, দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। শিক্ষা সংস্কারের চেয়ে বরং এখন আশু প্রয়োজন হলো শিক্ষার মানোন্নয়ন। গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা গেছে, যেখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা পঞ্চম শ্রেণী পাস করে দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞান লাভ করে, সেখানে রাতারাতি কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। অতএব, আমাদের এখন অন্য সংস্কারের কথা ভাবতে হবে। শিক্ষার মানের জন্য আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে। এটাই হবে এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। মূল বিষয় হলো কী পড়াতে হবে, কীভাবে পড়াতে হবে, সেটা নির্ধারণ করে সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের পড়িয়ে নির্দিষ্ট সময়ে যোগ্যতা অর্জনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।”

পরিশেষে বলা যায়, একমুখী শিক্ষাক্রম জগৎ ও জীবকে বিচার করার মত সংহত ও সমন্বিত যুক্তিবাদী চিন্তাধারা গড়ে তোলে। কারণ সকল শিক্ষার্থী একই বিভাগে পড়ে উক্ত যোগ্যতাসমূহ একইরূপ অর্জন করে। অপরদিকে এর অনুপস্থিতি শিক্ষার্থীদের মনোজগতকে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে। এই বিভাজন তৈরির পাশাপাশি জাতিয় একমুখী শিক্ষাব্যবস্থার অনুপস্থিতি গোটা জাতির বিজ্ঞানমনস্ক সংহত মননের বিকাশ ধারাকেও স্থবির করে দেয়। বিজ্ঞানের ওপর যাদের সামান্য ধারণা আছে তারা জানেন একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটা বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে সত্য একটাই অবস্থান করে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে বহু সত্যের ধারণা বিজ্ঞানবিরোধী। ফলে জীবন এবং জগতকে বুঝবার এবং পাল্টাবার জন্য বুনিয়াদি জ্ঞান বা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হলে একই পদ্ধতির বৈষম্যহীন বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় একমুখী শিক্ষার বিকল্প নেই। কিন্তু তাই বলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয় ও দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা না করে যেকোন পরিবর্তন বা সংস্কার করা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। সুতরাং একমুখী শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করতে হলে যেসব সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে তার সমাধান আগে প্রয়োজন। তারপর শিক্ষাবিদ ও অন্যান্য সবার সাথে আলোচনা করে সবার সম্মতিতেই নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৫. উপসংহার

বাংলাদেশে যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তা শুধু বিজ্ঞানবিরোধী নয়, শোষণ-শাসনের জন্যও উপযোগী। মনস্কৃতবিদদের এ সংক্রান্ত গবেষণা ও সিদ্ধান্ত দিয়ে মিথ্যে নয়, তা কেউই অস্বীকার করতে পারে নি। বিগত সরকারের আমলে গঠিত শামসুল হক কমিশনের ১৯৯৭

প্রতিবেদন মতে ‘বিভিন্ন ধারা প্রচলিত থাকার ফলে শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই শিশুদের যোগ্যতার মধ্যে যেমন তারতম্য গড়ে ওঠে, তেমনি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের মধ্যেও ভিন্নতা তৈরি হয়।’ বর্তমান সরকারের আমলে গঠিত মনিরুজ্জামান মিয়া কমিশনও ‘ধর্ম-গোষ্ঠী, নারী-পুরুষ ও অঞ্চল ভেদে যাতে পাঁচ বছর বয়সী সব শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা যায় এবং সবাইকে একই মানের শিক্ষাদান করা যায়, সে বিষয়ে স্কুল পরিচালনা পরিষদ এবং সরকারকে উৎসাহী হতে সুপারিশ করেছে।’^{১০}

মূলত মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (সেসিপ) এর কার্যক্রম বিগত সরকারের আমলে শুরু হয়ে এখন তা বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে। সুতরাং দলমত নির্বিশেষে সবার মতামতের ভিত্তিতে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা আবশ্যিক। শিক্ষাক্ষেত্রে এত বড় সংস্কার ও পরিবর্তন আনার আগে দলমত ভুলে সবার সঙ্গে আলোচনা-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন। শিক্ষানীতি প্রণয়ন বা কোনো নতুন শিক্ষাক্রম চালু করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার মতো শুরু থেকেই একটি বিষয়ে নতুন কিছু করা বা কোনো পরিবর্তন আনার আগে তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। এজন্য বিদেশি বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শকদের পাশাপাশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশের খ্যাতনামা কারিকুলাম বিশেষজ্ঞদের অন্ডর্ভুক্ত করতে হবে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অভাব, শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব পূরণ না করা, সব স্কুলে সমমানের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি না করা, শিক্ষকদের ব্যাপকভাবে এ নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে না জানানোসহ নানাবিধ কারণে সরকারের উদ্যোগ বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, যোগ্য ও প্রশিষ্টপ্রাপ্ত শিক্ষক ইত্যাদির যে ঘাটতি রয়েছে আগে সে সব সমস্যার সমাধান করতে হবে, তারপর বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করা যুক্তিযুক্ত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, কয়েক যুগ ধরে চলমান একটি শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের পূর্বে আরও অনেক বিষয়ে ভাবতে হবে। এজন্য দলমত নির্বিশেষে অভিজ্ঞ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে দেশের জ্ঞানী-গুণী, অভিজ্ঞ শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকদের এবং ছাত্র

৬. তথ্যসূত্র

১. জাতিয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন-২০০৩, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, মার্চ-২০০৪. পৃ:-৮৫।
২. শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন-২০০৩, পৃ:-vi।
৩. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, মাধ্যমিক স্তর (নবম-দশম শ্রেণী) প্রতিবেদন, পার্ট-২, এনসিটিবি, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৮-২২।
৪. http://www.nctb.gov.bd/english/pdf/general_science_manual.pdf
৫. দৈনিক সমকাল, ‘একমুখী শিক্ষা নিয়ে সংশয়’, ০৩ ডিসেম্বর, ২০০৫।
৬. খান, সিদ্দিকুর রহমান, সরকার নতুন মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করছে, দৈনিক নিউ এজ, ০১ আগস্ট, ২০০৫।
৭. শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন-২০০৩, পূর্বোক্ত।
৮. খান, সিদ্দিকুর রহমান, পূর্বোক্ত।
৯. শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন-২০০৩, পূর্বোক্ত, পৃ:-৮৫।
১০. প্রাপ্ত, পৃ:- vi।
১১. রায়, মনোরঞ্জন, দৈনিক জনকণ্ঠ, ‘একমুখী শিক্ষার লক্ষ্যহীন পরিকল্পনা’, ০৩ ডিসেম্বর, ২০০৫।
১২. রহমান, ড. ছিদ্দিকুর, দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ অক্টোবর, ২০০৫।
১৩. প্রাপ্ত।
১৪. প্রাপ্ত।
১৫. <http://sanisoft.tripod.com/bdeshedu/systems.html>
১৬. দৈনিক জনকণ্ঠ, পূর্বোক্ত।
১৭. রহমান, ড. ছিদ্দিকুর, পূর্বোক্ত।
১৮. প্রাপ্ত।
১৯. প্রাপ্ত।
২০. ইসলাম, শহীদুল, একমুখী শিক্ষার দর্শন - দৈনিক যুগান্ত, ০৬ ডিসেম্বর, ২০০৫।
২১. রশিদ, অধ্যাপক হারুনুর, দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ নভেম্বর, ২০০৫।

প্রসঙ্গ: বাক্শিল্প

শ্যামলী আকবার *

বাক্শিল্প- শামসুল হক। প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র- ১৪১২, সেপ্টেম্বর : ২০০৫। প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন। পৃষ্ঠা : ১৪২। মূল্য : ১৪০.০০ টাকা। প্রকাশক: অশোক রায় নন্দী, নবযুগ প্রকাশনী, ২/৩ প্যারীদাশ রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।



‘বাক্শিল্প’ মূলত বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে ভাষাভিত্তিক মৌখিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রচিত। আমরা জানি, বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে ভাষা ও সাহিত্যানুশীলনের ক্ষেত্রে মৌখিক ভাষাভিত্তিক তৎপরতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু গুরুত্বানুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভাষাভিত্তিক মৌখিক তৎপরতা কম-বেশি অনুশীলনের প্রচেষ্টা থাকলেও এ বিষয়ে সহায়ক বই-পত্রাদির অভাব রয়েছে যথেষ্ট। সে অভাব আংশিকভাবে পূরণের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন। তাই আমাদের সংস্কৃতিচর্চায় ও মননশীলতায় এই বইটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

গ্রন্থটির ‘ভূমিকা’ অংশ থেকে জানা যায়, ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত ‘মুখের কথা : বাচনিক তৎপরতা’ নামে লেখকের যে একখানা বই প্রকাশিত হয়, ১৯৯২ সালের পরে সে বই- এর সরবরাহ না থাকায় বইটি পরিমার্জিত আকারে পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুনর্মুদ্রণ আর হয় নি। তবে সুখের বিষয়, ২০০৫ সালে প্রণীত প্রচুর তথ্যভিত্তিক অথচ প্রায় একই আদলে মূলবিষয়ভিত্তিক নতুন বই ‘বাক্শিল্প’ নবযুগ প্রকাশনীর সৌজন্যে প্রকাশের সুযোগ পায়।

‘বাক্শিল্প’ গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক শামসুল হক একজন সচেতন শিক্ষাবিদ। ভাষা ও সাহিত্যানুরাগী সংস্কৃতিমনা অগ্রহী শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য উৎসাহী পাঠকের শুভার্থী হিসেবে ভাষাভিত্তিক মৌখিক অনুশীলনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত তাঁর এই গ্রন্থ প্রণয়ন।

তথ্যবহুল ও দিক নির্দেশনা সংবলিত এই বইতে আগের বইয়ের বিষয়বস্তু অনুসৃত হলেও আংশিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সংযোজিত হয়েছে বেশ কিছু নতুন তথ্য, অধ্যায় এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিশিষ্ট। সূচিপত্র অনুসারে ১৫টি অধ্যায় বা নির্বাচিত বিষয়বস্তু ভাষাভিত্তিক মৌখিক তৎপরতার বিভিন্ন কৌশল ও মাধ্যমকে সামনে রেখে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এগুলো হলো : শিশুর কথা শেখা, মুখের কথার প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া, কথা শেখার প্রয়োজন, কথা শেখানো, বাক্প্রত্যঙ্গ, বর্ণ ধ্বনি উচ্চারণ, পাঠ থেকে অভিনয়, আবৃত্তি, বক্তৃতা, রেডিও-টেলিভিশন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা, বিতর্ক, আলোচনা, সভাপতির দায়িত্ব,

* শ্যামলী আকবার- সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাকদক্ষতা মূল্যায়ন এবং বাক্ স্বাধীনতা মানবাধিকার ও আইনের শাসন। তবে, ওপরে উলে-খ করা নির্বাচিত বিষয়সমূহ গ্রহে ‘অধ্যায়’র অস্ভূজ বিষয় হিসেবে উলে-খ করা হলেও, সূচিপত্রের কোথাও ‘অধ্যায়’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। সেক্ষেত্রে ১৫টি নির্বাচিত বিষয় নিয়ে যেভাবে গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে- তাতে, ‘অধ্যায়’ শব্দটির পরিবর্তে ‘পরিচ্ছেদ’ শব্দটির ব্যবহার বোধ করি অনেক-বেশি যৌক্তিক ছিল।

গ্রন্থটির প্রথম চারটি অধ্যায়ের মধ্যে এক ধরনের নৈকট্য ও পারস্পর্য খুঁজে পাওয়া যায়। জন্মের পর থেকে শিশুর কথা শোনার এবং শেখার প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করে কথা শেখার অনুকূল পরিবেশের অপরিহার্যতাকে এক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মানুষের মুখের কথার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং সফল জীবন-যাপনের জন্য মৌখিক ভাব-বিনিময়ের প্রক্রিয়াটির স্বরূপ কি-সে সম্পর্কেও ধারণা প্রদান করা হয়েছে। সর্বোপরি, বাক্শিল্পের বিকাশ সাধন এবং বাক্ ব্যবহার সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে যে, মানুষের কথা শেখার এবং শেখানোর দরকার আছে, লেখক তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতা ও অর্জনের আলোকে বিষয়টি সূক্ষ্মভাবে অনুভব করে প্রথম চারটি অধ্যায়ে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

আগেই বলা হয়েছে, বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে লেখা এ চারটি অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুসমূহ একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বিশেষ করে তৃতীয় অধ্যায়ের ‘কথা শেখার প্রয়োজন’ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ের ‘কথা শেখানো’র প্রসঙ্গটি। এক্ষেত্রে দুটো পৃথক অধ্যায় করা বা অধ্যায়ের সংখ্যা বৃদ্ধির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাছাড়া, প্রায় কাছাকাছি বিষয় একাধিক অধ্যায়ের মাধ্যমে অবতারণা পাঠকমনে বিভ্রান্তি ও জন্ম দিতে পারে। তবে, বাংলাদেশে বিভিন্ন দশকে জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষা বাংলার মৌখিক চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা অর্জনের ওপর কতটা গুরুত্বারোপ করা হয়েছে- তার বিভিন্ন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অর্জিতব্য যোগ্যতার বিবরণ- এ সবই চতুর্থ অধ্যায়ের একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ সংযোজন। যার মাধ্যমে মৌখিক ভাষাভিত্তিক তৎপরতার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ, জাতির এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও চিন্তা-ভাবনার একটি সুস্পষ্ট চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তাছাড়া, জীবনে সাফল্য অর্জনের অন্যতম চাবিকাঠি আব্যশ্যিক গতিতে বলতে ও পড়তে পারা। সেক্ষেত্রে মুখের কথায় সফল জীবন-যাপনের প্রধান অবলম্বন। আর এই অবলম্বনটি সার্থকভাবে ব্যবহার করতে শেখানোর দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে গুরুত্ব করে শিক্ষক পর্যন্ত কেউই যে এড়াতে পারেন না, সে বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ের বিস্তৃত আলোচনা লেখকের দূরদর্শিতার ও আন্তরিকতার পরিচয় বহন করে।

‘বাক্প্রত্যঙ্গ’ এবং ‘বর্ণ ধ্বনি উচ্চারণ’ বিষয়ক পরবর্তী অধ্যায় দুটোও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আলোচিত অধ্যায় দুটোকে মৌখিক ভাষাভিত্তিক অনুশীলনের ভিত্তি বললে আশা করি অত্যন্ত হবে না। কেননা, বাক্প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেই ঘটে কথার স্ফুরণ ও বিকাশ। এর কোন না কোন প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি; আর বর্ণ হচ্ছে ধ্বনির প্রতীক। প্রয়োজনীয় কথা বলার সময় আঞ্চলিক প্রভাব মুক্ত হয়ে বা বাক্ অভ্যাস পরিবর্তন করে গ্রহণযোগ্য উচ্চারণ আয়ত্ত করার লক্ষ্যে ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলো সুস্পষ্ট ও যথার্থ হওয়া দরকার। সে উদ্দেশ্যেই এসব অধ্যায়ে কথা বলায় বাক্-প্রত্যঙ্গসমূহের ব্যবহার এবং উচ্চারণ সূত্র সম্পর্কে লেখকের অবহিত করার প্রয়াস প্রশংসনীয়। জটিল ও দুরূহ বিষয়টিকে লেখক উলি-খিত দুটো অধ্যায়ে অত্যন্ত সহজ, সরল, সাবলীল ভাষায় প্রয়োজনীয় উদাহরণ ও ছক ব্যবহার করে দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। পরিপাটিভাবে বিন্যস্ত সাধারণের বোধগম্য, উপযোগী এ অধ্যায় দুটো পরিশীলিত বাক্অভ্যাস উদ্ধৃতিকরণেও শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সহায়তা করবে বলে ধারণা করা যায়। তবে,

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম ‘ধ্বনি বর্ণ উচ্চারণ’ না হয়ে ‘বর্ণ ধ্বনি উচ্চারণ’ হওয়ার পিছনে লেখকের কোন ভাবনা কাজ করেছে তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু ‘বর্ণ’ কথাটি শিরোনামের আগে জুড়ে দেওয়ায় যে প্রশ্নটি থেকে যায়, তা হল ধ্বনি ও বর্ণ উভয়েই উচ্চারণে ভূমিকা রাখলেও, ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনিকে কেন্দ্র করেই তো বর্ণের সৃষ্টি! তাহলে শিরোনামে ‘ধ্বনির’ আগে ‘বর্ণের’ আসন কেন?

সপ্তম অধ্যায়ে ‘পাঠ থেকে অভিনয়’ প্রসঙ্গ উদ্ভাপিত হলেও এর সাথে প্রাসঙ্গিক অধ্যায় হিসেবে দ্বাদশ অধ্যায়ের ‘আলোচনা’ পর্যন্ত মাঝের প্রতিটি অধ্যায়ের নির্বাচিত বিষয় একে অপরের সাথে কম-বেশি সম্পৃক্ত, পরিপূরক। এসব অধ্যায়ে সংযোজিত বিষয়সমূহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক প্রতি ক্ষেত্রে বাকচর্চার মাধ্যমে দক্ষতা ও নৈপুণ্যে উন্নীত হয়ে মৌখিক ভাষা ব্যবহার কীরূপে বাকশক্তিতে পরিণত হবে এবং শ্রীমস্ত শিল্পরূপ ধারণ করবে তারই আনুষ্ঠানিক ইঙ্গিত বহন করে। লেখকের বরাত দিয়েই বলতে হয়-‘বাচনিক তৎপরতা- বিশেষত বক্তৃতা, বিতর্ক, আলোচনা কেবল শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমই নয়, এ সকল তৎপরতা সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা করার এবং সমাধানেরও হাতিয়ার।’ তাই গভীর অন্বেষণ-সম্পন্ন লেখকের ভাষাভিত্তিক বাচনিক বিষয়গুলো সুস্থরূপে ফিরিয়ে আনতে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এ অধ্যায়গুলোর সংযোজন এবং এগুলোর নিয়ম-কানুন, কলাকৌশলের অবতারণা অত্যন্ত যুগোপযোগী প্রয়াস।

এয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায় দুটো লেখকের দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা এবং দায়িত্ববোধের প্রসার ঘটিয়েছে। এ দুটো অধ্যায় যথাক্রমে ‘সভাপতির দায়িত্ব’ এবং ‘বাকদক্ষতা মূল্যায়ন’। অধ্যায় দুটোর আলোচিত বিষয়বস্তু কেবল শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে অনুশীলনের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা নয়; সে গম্ভীর ছাড়িয়ে বৃহৎ সমাজে সুস্থির সিদ্ধান্ত ও তার যথার্থ মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্জনের সহায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। আর এখানেই কৃতিত্ব সব্যসাচী প্রবীণ লেখক অধ্যাপক শামসুল হকের। তথ্য ও মৌলিকত্ব বজায় রেখে লেখাকে সুখপাঠ্য করে, নির্দিষ্ট জগৎ-বৃত্তে বন্দি না হয়ে, নির্লোভ জীবন-যাপন, মূল্যবোধ-নির্ভর দৃষ্টিকোণ এবং সচেতন ব্যক্তিক প্রজ্ঞা থেকে এসব অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর গভীরে যাওয়ার প্রবণতা তাঁকে করেছে স্বয়ংসম্পূর্ণ, উজ্জ্বল ও অভিব্যক্তিমস্ত।

সর্বশেষ অধ্যায় ‘বাক স্বাধীনতা মানবাধিকার ও আইনের শাসন’ - এ গ্রন্থের নতুন সংযোজন। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে শুধু জ্ঞানচর্চা নয়, ব্যক্তি থেকে আনুষ্ঠানিক পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করা এবং তার সমাধানের হাতিয়ার হিসেবে বাচনিক তৎপরতার কথা বলা হয়েছে। এর বিস্তৃত আলোচনার ভিত্তিতে বলা চলে সুশিক্ষার অর্থ তখনই প্রতিষ্ঠা পায়, যখন বাচনিক আচরণ হয় শালীন, শোভন। সে অর্থে আধুনিক সমাজে নিজের মতামত পোষণ ও প্রকাশের অধিকার এবং অন্যের মতামতের প্রতি সম্মান ও সহনশীলতা প্রদর্শনের শিক্ষা সুশিক্ষার অন্বেষণ বিষয়। যা পঞ্চদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট এবং যৌক্তিকভাবে লেখক উপস্থাপন করেছেন। সে অর্থে এটি একটি চমৎকার শক্তিশালী অধ্যায়। আজকের তথাকথিত সভ্য সমাজের, রাষ্ট্রের মানুষেরা ধ্যানে- জ্ঞানে বাক স্বাধীনতা এবং আইনের শাসনকে সমুন্নত রাখার জন্য সচেতন তো নয়ই; প্রয়োগে এবং বাস্তবায়নেও অসহায়। এ অধ্যায়ে লেখক অত্যন্ত দায়িত্বের পরিচয় দিয়ে নতুন করে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রের আবশ্যিক কর্তব্য হিসেবে বাক স্বাধীনতা মানবাধিকার ও আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

গ্রন্থটির আকর্ষণীয় ও চমৎকার সংযোজন হলো ‘পরিশিষ্ট’। ‘বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ থিয়েটার আর্টস’- বিটা (BITA) -র আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের একটি পরিষ্কার চিত্র এখানে

তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে আবৃত্তিতে উৎসাহী অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠী নিজস্ব কার্যক্রম প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সহায়তা পেতে পারে অথবা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনুশীলনীর জন্য উদ্বুদ্ধ বা সচেতনও হতে পারে। তাই এ ধরনের ‘পরিশিষ্ট’ অংশের সংযোজন লেখকের বিচক্ষণতারই প্রমাণ দেয়।

‘বাক্শিল্প’ ব্যতিক্রমী ঢঙে লেখা একটি গ্রন্থ। এখানে লেখকের বয়ানভঙ্গি যেন লেখ্য নয়; কখনো কখনো মনে হয়েছে কথ্য। তাঁর পাঠক যেন শ্রোতা। যে পাঠক উপস্থাপনা ভঙ্গির মধ্যে শিল্পের অভিনবত্ব খুঁজে পেতে চায়, ‘বাক্শিল্প’ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে তাকে তৃপ্ত করবে। সহজ, সরল শব্দ প্রয়োগ; বেগ-আবেগসিক্ত বাক্যবিন্যাস; সতেজ, ফুরফুরে মেজাজের সাবলীল ভাষা ব্যবহার—গ্রন্থটিকে করেছে প্রাঞ্জল ও গতিময়। যদিও বানানের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মুদ্রণজনিত ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে তবে, দীর্ঘদিনের শ্রম ও নিষ্ঠার ফসল এ গ্রন্থ আশা করি- আধুনিক সংস্কৃতিমনা, বাক্চর্চায় আগ্রহী শিক্ষক-প্রশিক্ষণে নিয়োজিত পাঠক মহলে সমাদৃত হবে।

সর্বোপরি, সৃষ্টিশীল ও মননশীল সাহিত্যচিন্ত্রর মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিসীমাকে প্রসারিত করে সাহিত্যাঙ্গনে লেখক অধ্যাপক শামসুল হক এ গ্রন্থ রচনা করে নিজেকে একটি স্বতন্ত্র সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখানেই তাঁর সাফল্য, তাঁর সিদ্ধি।

দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদে সজ্জিত তাঁর এ বইটির বহুল প্রচার কাম্য।

শিক্ষার কালপঞ্জি*

শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা ও নীতিমালা সংক্রান্ত কালপঞ্জি : ১৮৫৪-২০০৫

- ১৮৫৪ ব্রিটিশ হাউজ অফ কমন্স উড'স-এর শিক্ষা রিপোর্ট, ১৮৫৪ অনুমোদন করে। এটি বাংলায় আধুনিক সাধারণ শিক্ষার আইনগত ভিত্তি প্রদান করে।
- ১৮৫৯ লর্ড স্ট্যানলি এ-মর্মে সুপারিশ করেন যে, সরকারের সরাসরিভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত এবং ১৮৫৯-এর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় মেটানোর জন্য প্রয়োজনবোধে স্থানীয়ভাবে করারোপ করা উচিত।
- ১৮৭১ লর্ড মেয়ো শিক্ষা বিভাগ থেকে অর্জিত আয় শিক্ষা প্রকল্পে ব্যয়ের জন্য প্রাদেশিক সরকারকে কর্তৃত্ব প্রদান করেন।
- ১৮৭৭ বিকেন্দ্রীকরণ নীতির আওতায় লর্ড লিটন পঞ্চ-বার্ষিকী বন্দোবস্তে প্রবর্তন করেন, যার ফলে শিক্ষা পাঁচ বছরের জন্য প্রাদেশিক সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আসে। তদুপরি আইন ও আবগারি বিভাগ থেকে অর্জিত আয়ের একাংশ শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার দেশব্যাপি শিক্ষানীতি নির্ধারণের মতো বিষয়টিকে নিজ হাতে সংরক্ষণ করে। এ ব্যবস্থা ১৮৮২ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে।
- ১৮৮২ লর্ড হান্টারকে চেয়ারপার্সন করে লর্ড রিপন ১৮৮২-র ৩ ফেব্রুয়ারিতে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।
- ১৯০১ সিমলায় সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯০৪ ১৯০৪ সনের ১১ মার্চ লর্ড কার্জন সরকারি সিদ্ধান্তে আকারে তাঁর শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। ১৯০৫ স্বদেশী আন্দোলনের অংশ হিসেবে জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ গঠিত হয়। এর উলে-খযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী, রাসবিহারী ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ১৯০৬ কলকাতা থেকে ১৯০৬ সনে জাপানি শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর একটা সরকারি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।
- ১৯১০ ১৯১০ সালের আগে শিক্ষা ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের আওতাধীন ছিল। ১৯১০ সন থেকে ভূমি ও স্বাস্থ্য এ দুটি বিভাগও নবগঠিত শিক্ষা বিভাগের সাথে যুক্ত করা হয়।
- ১৯১২ ১৯১২ সালে বিনা বেতনে মৌলিক শিক্ষা চালু হয়।

* পাওয়ার এন্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক প্রতিবেদন 'হালখাতা' ২০০৬ থেকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে 'শিক্ষার কালপঞ্জি'র তথ্যসমূহ সংকলিত হল। উলে-খ্য যে, দুয়েকটি অতিরিক্ত তথ্য এতে সংযোজিত হয়েছে। - সম্পাদক

- ১৯১৩ ১৯১৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভারত সরকার শিক্ষানীতির প্রস্তুত পাস করে।
- ১৯৩০ ১৯৩০ সালের 'বেঙ্গল এডুকেশন বোর্ড' আইন পাশ হওয়া একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা; এর আওতায় দেশে স্কুল বোর্ড গঠিত হয় আর এটিই হয় প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক দপ্তর।
- ১৯৩৫ ১৯২৭ সালের হার্টজ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়, যার ওপর শিক্ষার সকল বিষয় সমন্বয় করার দায়িত্ব অর্পিত হয়।
- ১৯৩৭ এগারোটি প্রদেশে স্বায়ত্ত শাসন চালু হয়। মহাত্মা গান্ধী শিক্ষার জন্য বাস্তবসম্মত ও উপযোগী Wardha Scheme-এর ধারণা উপস্থাপনা করেন। জনগণের জন্য নিখরচা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুত অসম্ভব ছিল এতে। এ প্রকল্পের অন্যতম চিন্তা ছিল কুটির শিল্পের মাধ্যমে মৌলিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান।
- ১৯৪৫ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি পৃথক শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এর দায়িত্ব দেয়া হয় কেন্দ্রীয় প্রশাসকের একজন সদস্যকে।
- ১৯৪৭ ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর হতে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে প্রথম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৪৯ মওলানা আকরাম খান শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়।
- ১৯৫১ ৪-৬ ডিসেম্বর ১৯৫১ করাচীতে দ্বিতীয় শিক্ষা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৫২ প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী প্রকল্প তৈরি হয় এবং এতে শিক্ষা খাত অগ্রাধিকার পায়।
- ১৯৫৮ সামরিক শাসন জারি হয় এবং শিক্ষার জন্য শরিফ কমিশন গঠিত হয়।
- ১৯৬১ মাধ্যমিক স্কুলসমূহের ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত 'দি ইন্সট পাকিস্তান ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৬১'তে আইনগত বিধান সন্নিবিষ্ট করা হয়।
- ১৯৬২-৬৪ শরিফ কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়; ছাত্ররা গণমুখী শিক্ষানীতি দাবি করে। ১৯৬৪ সালে নতুন বিচারপতি হামদুর রহমানের নেতৃত্বে নতুন শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশন একই বছর তার রিপোর্ট পেশ করে।
- ১৯৬৯ আইয়ুব খানের শাসনকাল শেষে এয়ার মার্শাল নুর খানের নেতৃত্বে নতুন শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশন একই বছরে রিপোর্ট প্রদান করে।
- ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়।
- ১৯৭২ ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠিত।
- ১৯৭৪ প্রাথমিক বিদ্যালয় (অধিগ্রহণ) আইন পাশ হয়। এতে বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আইন করে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা জেলা বোর্ড থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বদল করা হয়। এ বছরে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে।
- ১৯৭৮ প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ শহরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (National Academy for Primary Education

- NAPE) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার আওতাধীন শিক্ষক, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষক ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষকদের পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ ও প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ডগবেষণার উদ্দেশ্য-ই এটি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য।

১৯৭৮-৭৯ একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়, যা ১৯৭৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে অস্বর্জীকালীন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পেশ করে।

মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ (১৯৭৮) জারি করা হয়।

১৯৮০ মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই দশক থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক প্রসার আরম্ভ হয়।

১৯৮১ প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৮১ ডিক্রি আকারে জারি হয়; এর আওতায় মহকুমা (যা পরবর্তী সময়ে জেলা হয়) স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের সংস্থান রাখা হয়। তবে এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয় নি।

১৯৮৯ এরশাদ সরকারের এক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি ভাষা চালু করা হয়। এর আগে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি পড়ানো হতো।

১৯৯০ সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন (The Compulsory Primary Education Act: CPE) প্রণীত হয়।

১৯৯১ বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন পাস হয়। সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম (পরবর্তীতে) চালু হয়।

১৯৯২ দেশের ৬৪টি জেলার ৬৮টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়। সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯২-৯৪ সনে একটি জাতীয় প্রকল্পের অধীনে ৪-৫ বছর বয়সী ৬৭,৫০০ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

১৯৯৩ পুরো দেশকে CPE কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়।

১৯৯৪ মাদ্রাসাসমূহ পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক অর্থ সহায়তা করে।

১৯৯৫ সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটা সর্বাঙ্গীণ কার্যক্রম হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম (PEDP-1) চালু হয়।

১৯৯৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ড. আব্দুল-হা আল-মুতী শরফুদ্দীনকে আহ্বায়ক করে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ‘জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি’ গঠন করে। ১৯৯৭-এ কমিটি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করে। কমিটির ১৮ দফা সুপারিশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে দেশের রাজস্ব আয়ের ন্যূনপক্ষে পাঁচ শতাংশ খরচের কথা বলা হয়।

১৯৯৭ প্রফেসর শামসুল হকের নেতৃত্বে ‘জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি’ গঠিত হয়। কমিটি আগস্ট ১৯৯৭-এ রিপোর্ট পেশ করে। এ কমিশনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত দেশের সকল প্রকার

শিক্ষার জন্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম চালুর সুপারিশ করা হয়।

- ১৯৯৯ জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা-১ (National Plan of Action) অনুমোদিত হয়। এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এনসিটিবির বই প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বেসরকারি ইংরেজি স্কুল নিবন্ধীকরণ বিধিমালা ‘সবার জন্য শিক্ষা’ নীতি ইস্যু করা হয়।
- ২০০০ জাতীয় সংসদে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ অনুমোদিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন প্রণয়ন করা হয়।
- ২০০১ প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে ‘জাতীয় শিক্ষা কমিশন’ গঠিত হয়।
- ২০০২ বৃত্তি কার্যক্রম ও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কার্যক্রমকে আবর্তিত করে প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু হয়; এর আওতায় প্রাথমিক স্কুলের ৪০% শিক্ষার্থীকে আর্থিক বৃত্তি প্রদানের সংস্থান রাখা হয়।
- ২০০৩ DNFPE রহিত করা হয়। বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়।
- ২০০৪ মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন তাঁদের রিপোর্ট পেশ করে।
বিশ্ব-ব্যাপকের অর্থ সহায়তায় চারশত কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ সংবলিত (Reaching Out of School Children) প্রকল্পের কাজ শুরু হয় এবং ৫৫০০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ সংবলিত PEDP-2 চালু হয়, এই প্রকল্পের মেয়াদকাল ২০০৫-২০০৯।
মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে নাগরিকদের উদ্যোগে সুশিক্ষা আন্দোলন গঠিত হয়।
- ২০০৫ দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র (পিআরএসপি)-র চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।